অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

ঝিকরগাছায় ঝাট

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. ঝিকরগাছার হাট 2
২. সনাতন রায় আর পাঁচটা হাটুরের মতো নয় 11
৩. তেমন দায়ে পড়লে দুর্গা মালো 26
৪. ঝিকরগাছার হাটে ঘুরে বেড়ানো 32
৫. রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে 38
৬. ম্যাজিশিয়ান, বারো ধাপ, ভূত ঘর 59
৭. দুর্গা মালোর কাণ্ড 69
৮. রাজবাড়ির ফটকের উলটোদিকে 78

১. ঝিকরগাছার হাট

ঝিকরগাছার হাট হল এ-তল্লাটের সেরা। একধারে গ্যাঁড়াপোতার খাল আর অন্য ধারে মহীনরাজার ঢিবি, মাঝখানে বিশাল চত্বর জুড়ে রমরম করছে হাটখানা। এখানে না পাওয়া যায় এমন জিনিস কমই আছে। পরগনার সব ব্যাপারিই এসে জোটে। তেমনই খরিদ্দারের ভিড়। যেমন বিকি, তেমনি কিনি। সকাল থেকে রাত অবধি কত টাকাপয়সা যে হাতবদল হয় তার লেখাজোখা নেই।

তা বলে সবাই যে এসে ঝিকরগাছার হাটে পয়সা কামিয়ে নিয়ে যায় বা জিনিসপত্র কিনতে পারে তা নয়। ওই যে নবগ্রামের রসো পান্তি মুখোনা হাসি হাসি করে গন্ধবণিকদের দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করছে আর চতুর চোখে চারদিকে চাইছে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না। হরিহরপুরের প্রসন্ন হালদারের কোমরের গেজেতে না হোক আজ তিন-চার হাজার টাকা আছে। হালদারের পো-র পাটের দড়ির কারখানা। ঝিকরগাছার হাটে ফি হাটবারে শস্তায় পাটের গুছি কিনতে আসে। তা সেই গেজেটাই তাক করে অনেকক্ষণ ধরে তক্কে তক্কে ঘুরছে রসো। সঙ্গে চেলা হাদু। গেজেটা গস্ত না করলে চেলার কাছে মান থাকবে না। কিন্তু রসো পান্তির সেই দিন আর নেই। বয়স হওয়ায় হাত-পা তেমন চলে না। আর লোকজনও ক্রমে সেয়ানা হয়ে উঠছে।

হাদু বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছিল, “সকাল থেকে কেবল হাঁটাহাঁটিই সার হচ্ছে যে! কাজকারবার কিছুই হল না।”

“হবে রে হবে। ব্যস্ত হলে কি হয়?” প্রসন্নর সঙ্গে ওর শালা

রেমোটাও রয়েছে। সর্বদা চোখে চোখে রাখছে। প্রসন্নর কোমরখানার দিকেই ওর চোখ। “একটু ধৈর্য ধর বাবা, রেমোর খিদে বা জলতেষ্টা পেলে বা চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা

হলেই হয়। একটু আনমনা হলেই দেখবি চোখের পলকে প্রসন্নর কোমর সাফ হয়ে যাবে।”

“ধুর মশাই, এত বড় হাটে কি আর প্রসন্ন ছাড়া মুরগি নেই? কত লোকে তো পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একটা ছোটখাটো দাও মারলেও জিলিপি শিঙাড়াটা হয়ে যায়।”

কথাটা মিথ্যে নয়। এসব কাজকারবারে একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে হয় না। মা-লক্ষ্মী নানা ট্যাঁকে এবং পকেটে ছড়িয়ে রয়েছেন। তবে রসো পান্তির স্বভাব হল, যাকে দেগে রাখবে তাকেই তাক করবে। ওভাবেই বরাবর বউনি করে এসেছে। বউনিটা ভাল হলে সারা দিনে ভালই দাও মারা যায়।

রসো পান্তির এখন খুবই দুর্দিন। যখন বয়সকালে হাত এবং মাথা সাফ ছিল তখন চেলাচামুণ্ডাও জুটত মেলা। কিন্তু এখন নানা নতুন ওস্তাদের আবির্ভাব হওয়ায় বেশিরভাগ চেলাই কেটে পড়েছে। শিবরাত্রির সলতে এখন ওই হাদু। সেও কেটে পড়লে রসোর আর চেলা থাকবে না। খুবই চিন্তার বিষয়। ঘঁদুকে তাই তুইয়ে বুইয়ে রাখতে হয়। সে শুনেছে, সিংহ নাকি একটা শিকারকেই তাক করে ধরে। সেটাকে ধরতে না পারলে অন্য শিকার ছোঁয় না। দিনেকালে সে সিংহ ছিল বটে, কিন্তু এখন আর শেয়াল ছাড়া কীই বা বলা যায় তাকে।

রসো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “তাই হবে রে বাপু, তুই মাথা গরম করিস না।”

দু হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে, “ওই দেখুন, নবু পালের পানের দোকানের সামনে কেমন বাবু চেহারার একটা লোক দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে। বাহারি চেহারাখানা দেখেছেন?”

তা দেখল রসো। বাবরি চুল, লম্বা জুলপি, গায়ে জরির কাজ করা সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে ধাক্কাপেড়ে ধুতি। তাগড়াই চেহারা, তাগড়াই মোচ। রাজা-জমিদারের বংশ বলেই মনে হয়। মুখটা চেনা নয়। এ-তল্লাটে নতুন উদয় হয়েছে বলেই মনে হয়।

নবুর পান খুব বিখ্যাত। হাঁচি পান, মিঠে পাত্তি বা বেনারসি পাত্তি যা চাও পাবে। মশলাও শতেক রকমের। ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে নবুর পান হল আকাশের চাঁদ। তবে যেসব হাটুরে দু'পয়সা কামাতে পারে তারা সদানন্দর রাবড়ি বা মালপোয়া, গদাধরের মাছের চপ, হরিপদর জিবেগজা আর পালোধি, রঘুপতির মালাই সন্দেশ কিংবা লেডিকেনি, বটকৃষ্ণর তেলেভাজা আর ঘুঘনি খেয়ে আইঢাই হয়ে নবুর একখিলি পান মুখে না দিলে আরাম বোধ করে না। সে এমন মশলাদার পান যে, মুখে দিলে বিশ হাত জুড়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যায়।

লোকটা পান মুখে দিয়ে নিমীলিত নয়নে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই চারধারটা দেখছিল।

হাদু উত্তেজিত গলায় বলে, "এ একেবারে রাজাগজা লোক। এবার একটু হাতের খেল দেখিয়ে দিন মশাই।"

রসো মৃদু গলায় বলে, "দাঁড়া বাপু, লোকটাকে আগে জরিপ করতে দে। হুট করে গিয়ে ঘাই মারলেই তো হবে না। হাবভাব একটু বুঝি। সেয়ানা না বোকা, ভ ভদ্রলোক না ভদ্রবেশী জোচ্চোর, সেসবও আঁচ করতে হয়, বুঝলি। এ-লাইন বড় কঠিন।"

হাদু বিরক্ত হয়ে বলে, "আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না মশাই। হরু দাস বা জগা হাটি হলে এতক্ষণে কাজ ফরসা হয়ে যেত।"

রসো অর্থাৎ রসময় পান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না, হাঁদুকে রাখা যাবে না শেষ অবধি। যদিও বটে বটতলার হরু দাস আর রাঘবপুরের জগা হাটি ইদানীং খুব নাম করেছে। রাঘবপুরের দারোগা গোবিন্দ কুন্ডু পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, হ্যাঁ, জগা হাটির মতো চালাকচতুর চোর তিনি ইহজন্মে দেখেননি। মোদ্দা কথাটা হল, নতুন যুগের এরা সব উদয় হচ্ছে আর পুরনো আমলের রসো পান্তি অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং দু একদিন সটকাবেই। বড় মায়া পড়ে গেছে ছেলেটার ওপর, তাই বুকটা টনটন করে বটে। এও ঠিক কথা, হুট করে কিছু করে ওঠা রসোর পদ্ধতি নয়। আগে শিকারকে নজরে রাখা,

মাপজোক করা, সবলতা দুর্বলতার আঁচ করা, তারপর ফাঁক বুঝে কাজে নেমে পড়াই হল তার চিরকেলে নিয়ম। কাজ ভন্ডুল হলে কপালে হাটুরে কিল, চাই কি পুলিশের গুঁতো এবং হাজতবাসও জুটতে পারে। কিন্তু নওজোয়ান হাঁদু ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে না।

হাদু ফের চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, "দু'হাতে ক'খানা আংটি দেখেছেন? তার ওপর গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার ঘড়ি!"

বিরস মুখে রসো বলে, "দেখেছি রে, দেখেছি। যা দেখা যাচ্ছে না তাও দেখেছি।"

"কী দেখলেন?"

"বাঁ পকেটে অন্তত কয়েক হাজার টাকা আছে।"

"কী করে বুঝলেন?"

"ওরে, দেখে দেখে চোখ পেকে গেছে কিনা।"

বাস্তবিকই তাই। লোকটা চারদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বাঁ পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট বের করে ভ্রূ কুঁচকে একটু দেখলে, তারপর লোকে যেমন বইয়ের পাতা ফরফর করে উলটে যায় তেমনি উলটে গেল। ফের পকেটে রেখে দিয়ে ঘুম ঘুম চোখে চারদিকে দেখতে লাগল।

হাঁদু চাপা গলায় বলে, "এবার চলুন।"

রসো সভয়ে বলে, "কোথায় যাব?"

"আমি গিয়ে লোকটাকে পেছন থেকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দিয়ে পালাব, আপনি দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে তুলে ধুলোটুলো ঝেড়ে দেবেন। আর সেই ফাঁকে–"

পাগল আর কাকে বলে! দশাসই ওই লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার মতো এলেম ছোটখাটো চেহারার হাঁদুর যে নেই সেটা রসোর চেয়ে ভাল আর কে জানে। কিন্তু ছেলেমানুষ, কিছু করার জন্য ভারী ছটফট করতে লেগেছে। বাধা পেলে বিগড়েই যাবে হয়তো। তাই অনিচ্ছে সত্ত্বেও রসো বলল, "চল তা হলে!"

কিন্তু এক কদম এগোতে-না-এগোতেই রসোর ডান পাঁজরে কে যেন একখানা পেল্লায় কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "খবরদার!"

গুতোর চোটে ককিয়ে উঠল রসো, "বাবা রে!" ঠিক একই সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে একখানা ল্যাং মেরে হাদুকে ফেলে দিল মাটিতে। হাদু পড়ে গিয়ে চেঁচাল, ভূমিকম্প হচ্ছে! ভূমিকম্প!

পেছন থেকে একটি সরু গলা রসোর কানের কাছে বলে উঠল, "খবরদার! ওটির দিকে নজর দিয়ো না। গত আধ ঘণ্টা ধরে আমি ওটাকে তাক করে রেখেছি। যদি ভাল চাও তো সরে পড়ো।"

ঘাড় ঘুরিয়ে রসো যাকে দেখল তাকে দেখে অনেকেরই রক্ত জল হয়ে যায়। সাতহাটির দুর্গা মালো। খুনজখম দুর্গার কাছে জলভাত। লাঠি সড়কিতে পাকা হাত, গায়ে অসুরের জোর। তার ওপর তার দলবলও আছে।

রসো সেঁতো হাসি হেসে বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তা আগে বলতে হয় রে ভাই। তোমার জিনিস জানলে কি আর ওদিকপানে তাকাই?"

হৃদু উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নিতান্তই নির্লজ্জের মতো হাত কচলে দুর্গাকে বলল, "ওস্তাদজি, কতদিন ধরে আপনার পায়ে একটু ঠাঁই পাব বলে বসে আছি। অধমকে যদি একটু ঠাই দেন..."

দুর্গা মালো চাপা একটা ফুঁ দিয়ে বলল, “যাঃ ব্যাটা তিনফুটিয়া, আমার দলে ঢুকতে হলে আগে বুকের ছাতি আর হাতের গুলি চাই, বুঝলি! এসব তোর কম্ম নয়। রসোর শাগরেদি করছিস তাই কর।”

হাদুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল রসো। আড়ালে এসে চুপিচুপি বলল, “ছিঃ ঘঁদু, এত অল্পেই হাল ছেড়ে দিলি? হুট করে গুরু বদলালে পাপ হয়, তা জানিস?”

হাঁদু হেঁদানো গলায় বলে, “তা কী করব মশাই, আপনার কাছে থেকে যে আমার কোনও উন্নতিই হচ্ছে না! আমাকে তো আখেরটা নিয়ে ভাবতে হবে নাকি?”

“অত সহজে হাল ছেড়ে দিস না। দুর্গা মালোর সঙ্গে টক্কর দিয়ে লাভ নেই। আয়, দু’জনে তক্কে তক্কে থাকি। দুর্গা হাতের সূক্ষ্ম কাজ কারবার জানে না। ওর হল মোটা দাগের হুড়ুম দুড়ুম কাজ। হাটের মধ্যে ওসব করার অসুবিধে আছে। আয়, আমরা বরং লোকটাকে দূর থেকে চোখে চোখে রাখি। ওর একখানা আংটির দামই পাঁচ-সাত হাজার টাকা।”

হাদু বিরস মুখে বলে, “কিন্তু মানুষের শরীর বলে কথা। ঘোরাঘুরিতে যে খিদেও পেয়ে গেল মশাই।”

“হবে হবে, সব হবে। খিদে-তেষ্টাকে জয় না করতে পারলে এ লাইনে কি টেকা যায় রে! মুনিঋষিদের কথা শুনিসনি? না খেয়ে তপস্যা করতে করতে পেটে পিঠে এক হয়ে যেত! চল বরং দুখিরামের দোকান থেকে দুটো গরম চপ খেয়ে নিবি।

জাদুকর ভজহরি বিশ্বাস ঝিকরগাছার হাটে ম্যাজিক দেখাচ্ছে কম করেও ত্রিশ বছর। আগে ম্যাজিক দেখতে লোক ভেঙে পড়ত। তাবুতে জায়গা হত না। ঝিকরগাছার হাট থেকে একদিনে তার দু-তিনশো টাকা আয় হত। কিন্তু সেইসব সুদিন আর নেই। দু’ টাকার টিকিট কেটেও কেউ আজকাল ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢোকে না বড় একটা।

ছেঁড়া তাবুতে শতেক তাপ্পি লাগাতে হয়েছে। ভজহরির জরির ঝলমলে পোশাকেরও আর জলুস নেই। পোশাকেও মেলা তালি আর রিপু। মাথার পাগড়িখানার রং চটে গেছে। ভজহরির এখন পায়ে গেঁটে বাত, মাথায় টাক, মুখ প্রায় ফোকলা। যৌবনকালে যেসব খেলা দেখাতে পারত তা আর এই বুড়ো বয়সের শরীরে কুলোয় না। দু'জন শাগরেদ আছে তার। লালু আর নদুয়া। আগের অ্যাসিস্ট্যান্টরা এখন নিজেরাই জাদুকর হয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। হাড়হাভাতে লালু আর নদুয়া এসে জুটেছে পেটের দায়ে। খেলা শেখায় তাদের মনও নেই, মাথাও নেই। তবু তারাও দু-চারটে এলেবেলে খেলা দেখায় বটে। কিন্তু লোকে আজকাল এসব বস্তাপচা পুরনো খেলা পছন্দ করে না।

তবু ভজহরি ফি-হাটবারে দুটো করে শো দেখায়। বেলা একটা থেকে তিনটে। সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। তাইতেই তার হাঁফ ধরে যায়।

নুন শোতে আজ লোক হয়েছিল সাকুল্যে বারোজন। খরচ তো উঠবেই না, উপরন্তু লোকসানই দিতে হবে। বিকেলের শোর আগে ভজহরি ভেতরে বসে জিরোচ্ছিল। বাইরে চেয়ারে বসে নদুয়া টিকিট বিক্রি করছে আর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করছে। ভজহরি ভাবছিল, এবার খেলা দেখানো ছেড়েই দেব। পরিশ্রম আর খরচ কোনওটাতেই পোষাচ্ছে না।

লালু এসে বলল, "ওস্তাদজি, মেয়ে কাটার খেলাটা ফের চালু করুন, ওটা লোকে খুব নেয়।"

ভজহরি খিঁচিয়ে উঠে বলে, "কচু নেয়। তা ছাড়া মেয়েই বা পাব কোথায়? ও খেলা দেখাতে যন্ত্রপাতি চাই, লোকলশকর চাই। পাব কোথা?"

চোখ বেঁধে তিরন্দাজির একটা জব্বর খেলা দেখাতেন বলে শুনেছি। একটা বাচ্চা মেয়ের মাথায় আপেল রেখে দূর থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় তির ছুঁড়ে আপেল গেঁথে ফেলতেন। সেটা ফের চালু করলে হয় না!"

হতাশ ভজহরি মাথা নেড়ে বলে, "না হে বাপু, ওসব আর আমার আসে না।"

খেলাটা শুনতে যত বিপজ্জনক আদতে ততটা নয়। স্টেজের এ-মুড়ো ও-মুড়ো টান টান করে একটা সরু আর শক্ত কালো সুতো বাঁধা থাকত। তির আর আপেল দুটোই পরানো থাকত সুতোর দু' প্রান্তে। তির ছাড়লে সেটা সুতো বেয়ে গিয়ে আপেলটা গেঁথে ফেলত। সে আমলের বোকাসোকা লোকেরা খেলা দেখেই খুশি, কলকৌশল নিয়ে মাথা ঘামাত না। আজকালকার চালাক-চতুর লোককে বোকা বানানো সহজ নয়।

তবে খেলাটা দেখাতে গিয়ে একবার নিজেই বড় বোকা বনে গিয়েছিল ভজহরি। তখন তার খুব নামডাক। গঙ্গাধরপুরের রাজবাড়ির রাস উৎসবে খেলা দেখাতে গিয়েছিল সেবার। রাজা পুরন্দরচন্দ্র বাহাদুর, রাজকুমার রাজেন্দ্রচন্দ্র, মহেন্দ্রচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, রানিমা, বউরানিরা সবাই উপস্থিত। বিরাট আসর। তখন ভজহরির মেয়ে হিমি মাথায় আপেল নিয়ে দাঁড়াত। তা সেবার হল কী, হিমি দাঁড়িয়েছে, ভজহরিও চোখবাঁধা অবস্থায় ধনুকে তির লাগিয়ে ছিলা টেনেছে। ঠিক সেইসময়ে পুটুং করে শব্দ করে সুতোটা ছিঁড়ে গেল। আর ভজহরি এমন ঘাবড়ে গেল যে, ভুল করে তিরটাও ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়েই মাথা চেপে বসে পড়ল। এ কী সব্বোনেশে কাণ্ড করল সে!

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হলে তুমুল হাততালি পড়ছিল। ভজহরি চোখের ফেট্টি খুলে দেখে, মেয়ে দিব্যি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। আর আপেলটা উইংসের পাশে তিরবেঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ ওরকম হওয়ার কথাই নয়।

গঙ্গাধরপুরের সেই আসরে আরও অনেক কাণ্ড হয়েছিল। লোকে ম্যাজিক মনে করে হাততালি দিয়েছিল বটে, কিন্তু একমাত্র ভজহরিই জানে যে, সেগুলো মোটেই ম্যাজিক ছিল না। ব্যাপারটা

সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

নদুয়া বলল,”লোকের মুখে মুখে আপনার ভূত নাচানোর খেলার কথাও খুব শোনা যায়। বলছিলাম কি ওস্তাদজি, সেগুলো ফের ঝালিয়ে তুললে হয় না?”

ভজহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “সেই রাবণও নেই, সেই লঙ্কাও নেই, বুঝলি! এবার আমার রিটায়ার করার সময় হয়েছে।”

নদুয়া ডুকরে উঠে বলে, “তা হলে আমাদের কী হবে?”

“তোর মতো অপদার্থের কিছু হওয়ার নয়।” বিকেলের শোয়ের সময় হয়েছে। ভজহরি মুখটুখ মুছে জল খেয়ে তৈরি হল।

লালু এসে উত্তেজিত গলায় বলল, “ওস্তাদজি, হাউস ফুল!”

“তার মানে?”

“দেড়শো টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। তাঁবুর ভেতরে আর জায়গা নেই।”

“বলিস কী?” অবাক কাণ্ডই বলতে হবে।

পরদা সরানোর পর ভজহরিও দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়। তাবুর ভেতরে বিস্তর মানুষ জুটেছে। সর্বাগ্রে তার নজর পড়ল, একদম সামনে শতরঞ্জির ওপর খুব রাজাগজা চেহারার একজন লোক বসে আছে। হাতে হিরের আংটি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, চুনোট করা ধুতি, মস্ত গোঁফ, চেহারাখানাও দেখার মতো। ভিড়ের মধ্যে অল্প আলোয় ভজহরি দুর্গা মালো, রসো পান্তি এবং আরও দু-চারজন সন্দেহজনক চরিত্রকেও দেখতে পাচ্ছিল। চুরি ছিনতাই রাহাজানি করে বেড়ায়।

ভজহরি খুশি হয়ে খেলা দেখাতে শুরু করল।

২. সনাতন রায় আর পাঁচটা হাটুরের মতো নয়

সনাতন রায় আর পাঁচটা হাটুরের মতো নয়। সে হাটে আসে সব বিটকেল জিনিস কিনতে। ওই তার এক বাতিক। যে জিনিস কারও কাজে লাগে না, যেসব জিনিস লোকে ফিরেও দেখে না, সেগুলিই গাঁটগচ্চা দিয়ে সে কিনে নিয়ে যায়। তা বলে সনাতন যে পয়সাওলা লোক তাও নয়। পয়সাওয়ালাদের পয়সা ওড়ানোর জন্য অনেক বাতিক জন্মায়। সনাতন নিতান্তই সামান্য একজন গরিব গোছের মানুষ। মাধবগঞ্জের বাজারে তার একখানা ছোটখাটো মনোহারি দোকান আছে। ব্যবসা ভাল চলে না। তবে সনাতনের কোনওক্রমে চলে যায়। তিনকুলে তার কেউ নেই। বুড়ি মা এতদিন বেঁচে ছিল, এই তো ছ'মাস আগে মাও মারা যাওয়ায় সনাতনের ঝাড়া হাত-পা। দোকানের পেছনেই তার দু'খানি ঘর, বারান্দা আর উঠোন নিয়ে একখানা বাড়ি। সেই ঘর দু'খানায় গেলে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। চিনেলণ্ঠন, ভাঙা পুরনো শেজবাতি, পুরনো পেতলের পিলসুজ, বহু পুরনো আবছা-হয়ে-আসা অয়েল পেন্টিং, তুলোট কাগজ আর তালপাতার কিছু পুঁথি, ব্রিটিশ আমলের পুরনো সেন্টের খালি শিশি, নাগাদের তির-ধনুক, দোয়াতদানি, অচল পয়সা কী নেই তার ঘরে! কেন এসব সে জমায়, জিজ্ঞেস করলে সনাতন কেবল লজ্জার হাসি হাসে। বিটকেল জিনিস কেনা ছাড়া তার আর কোনও শখ-আহ্লাদ নেই।

ঝিকরগাছার এই হাটে একজন দোকানদারের কাছেই সে আসে। সে হল মাথায় ফেজ টুপিওলা, জোব্বা পরা প্রায় নব্বই বছর বয়সের এক বুড়ো। তার নাম দানু।

দানুর দোকানে পুরনো বই, ছবি, পুঁথি, নানা জায়গার রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ির পরিত্যক্ত জিনিসপত্র থাকে। বেশিরভাগই অকাজের জিনিস। খদ্দেররা এসে সেসব নাড়াঘাটা করে বটে, কিন্তু দাম শুনে পিছিয়ে যায়। হ্যাঁ, দানুর জিনিসের দাম বেশ চড়া। তার ওপর সে বেজায় বদমেজাজিও বটে। মেজাজ দেখেও খদ্দেররা হটে যায়।

বড় করে পাতা একটা ত্রিপলের ওপর সাজানো পসরা। এক কোণে দানু গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসা। সনাতন একটা পুরনো বিবর্ণ চটি বই উলটেপালটে দেখছিল। বইটার নাম, সশরীরে অদৃশ্য হইবার কৌশল। সেখানা রেখে আর একখানা বই তুলল সে, শূন্যে ভাসিয়া থাকিবার সহজ উপায়।

"এসবে কি কাজ হয় দানুজ্যাঠা?"

দানু বিরস মুখে বলে, "কে জানে বাপু। আমি বই বেচে খালাস, কাজ হয় কি না তা বই যে লিখেছে তার সঙ্গে বুঝে নাওগে।"

দানুর ওরকমই ক্যাটকেটে কথা। বই রেখে সনাতন অন্যসব জিনিস দেখতে লাগল। হরেক জিনিস। ছোট-বড়-ভাঙা-আস্ত নানা আকৃতি আর প্রকৃতির জিনিস। পুরনো কলম আর দোয়াতদানি, জং ধরা ছুরি, বাহারি হাতপাখা–দেখতে দেখতে সনাতনের মাথা টাল খায়। একধারে ভঁই হয়ে থাকা রাবিশের মধ্যে সনাতন একটা কাঠের বাক্স দেখে সেটা টেনে আনল। বেশ ভারী বাক্স। ইঞ্চিদশেক লম্বা, সাত ইঞ্চির মতো চওড়া, আর চার ইঞ্চির মতো পুরু।

"এবাক্সে কী আছে দানুজ্যাঠা?"

"তা কে জানে বাপু। আমি খুলে দেখিনি?"

"দ্যাখোনি! সোনাদানাও তো থাকতে পারে।"

"তা থাকলে আছে।"

"দেখার ইচ্ছে হয়নি?" দানু বিরস মুখে বলে, "তা সোনাদানা থাকলেই বা আমার কী? আমার তিনকুলে কেউ নেই, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। সোনাদানা দিয়ে আমার আরহবেটাই বা কী, বলো তো বাপু!"

সনাতন বাক্সটা খোলার চেষ্টা করছিল।

দানু নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখে বলল, "ওভাবে কি খোলে রে বাপু। গা-তালা যে আটকানো আছে।"

"তা হলে চাবিটা দিন।"

"চাবি থাকলে তো আমিই খুলতুম। চাবিটাবি নেই। বন্ধ বাক্সটাই শুধু পেয়েছি। কিনতে চাইলে কিনতে পার, তবে হাজার টাকা দাম পড়বে।"

চোখ কপালে তুলে সনাতন বলে, "হাজার?"

"হ্যাঁ, বাপু। ভেতরে সোনাদানা থাকলেও তোমার। ইটপাটকেল থাকলেও তোমার।"

সনাতন বাক্সটার গায়ের ময়লা রুমালে একটু ঘষে পরিষ্কার করে নিয়ে দেখল, কালচে কাঠের ওপর নানা নকশা খোদাই করা আছে। এক-দেড়শো বছরের পুরনো তো হবেই।

সনাতন ভারী দোনোমোনোয় পড়ে গেল। হাজার টাকা অনেক টাকা। ভেতরে ইটপাটকেলই যদি থাকে তা হলে শুধু বাক্সটার দামই হাজার টাকা পড়ে যাচ্ছে। খুবই ঠকা হয়ে যাবে।

কিন্তু কৌতূহল বড়ই বলবতী। বন্ধ বাক্সয় কী আছে তা জানার অদম্য কৌতূহলও তাকে পেড়ে ফেলল। "কিছু কমসম হয় না দানুজ্যাঠা?" দানু পাথরের মতো নির্বিকার মুখ করে বলল, "কখনও দেখেছ এক পয়সাও দাম কমিয়েছি? এসব জিনিসের তো বাপু কোনও বাঁধাধরা দাম নেই। যার শখ চাপে সে কেনে। তাতে সে ঠকতেও পারে, জিততেও পারে। দাম কমাতে পারব না বাপু। ওই হাজার টাকাই দিতে হবে।"

সনাতন হিসেব করে দেখল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে তার কাছে হাজার টাকা হয়ে যাবে বটে, কিন্তু বাড়তি পয়সা কিছুই প্রায় থাকবে না। এবার চেপে শীত পড়েছে, সইফুলের দোকান

থেকে একখানা ফুলহাতা সোয়েটার কিনবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। এক শিশি গন্ধ তেল কেনারও শখ ছিল। একজোড়া চটিও না কিনলেই নয়। তা বাক্স কিনলে আর সেসব কেনা হবে না। বড়জোর এক কাপ চা আর দুটি শিঙাড়ার পয়সা পড়ে থাকবে পকেটে।

সনাতন ভারী বেজার মুখে গোঁজে থেকে হাজারটা টাকা বের করে দানুকে দিয়ে বলল, "বাক্স থেকে কী বেরোবে কে জানে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, বুঝলেন দানুজ্যাঠা?"

দানু হাজারটা টাকা আলগোছে নিয়ে আলখাল্লার পকেটে সাঁদ করিয়ে বলল, "তা বাপু, পরে আবার আমাকে দোষ দিয়ো না। কেনার জন্য তো তোমাকে মাথার দিব্যি দিইনি।"

"না দানুজ্যাঠা, আপনার আর দোষ কী?"

"ওবাক্সের জন্য আরও দু'জন এসে ঘুরে গেছে। একজন তিনশো অবধি উঠেছিল, অন্যজন পাঁচশো দিতে চেয়েছিল। আমি সাফ বলে দিয়েছি, এ-দোকানে দরাদরি হয় না। আমার দামে নিতে হয় নাও, নইলে কেটে পড়ো।"

সনাতন বাক্সখানা তার ঝোলাব্যাগে পুরে নিয়ে উঠে পড়ল। মনটা খচখচ করছে। হাজার টাকা বোকাদণ্ডই গেল আজ!

সনাতন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বেঁটেমতো রোগাপানা চেহারার একটা লোক এসে বেজার মুখে দানুকে বলল, "দিন দাদা, বাক্সখানা দিন। তিনশো বলেছিলাম, আরও না হয় দুশো দিচ্ছি।"

দানু ছোট চোখ করে লোকটাকে দেখে বলল, "বাক্স! বাক্স তো বিক্রি হয়ে গেছে।"

লোকটা চমকে উঠে বলে, "অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ হে, বিক্রি হয়ে গেছে।"

"কেন ছল-চাতুরি করছেন মশাই? না হয় আরও একশো টাকা দিচ্ছি। বড় পছন্দ হয়ে গেছে বাক্সখানা।"

দানু বিরস মুখে বলে, "মেলা ঘ্যানঘ্যান কোরো না তো বাপু। তোমার মুরোদ জানা আছে। বাক্স হাজার টাকাতেই বিক্রি হয়েছে। এবার কেটে পড়ো।"

লোকটা হঠাৎ মাথায় দু'হাত চেপে বসে পড়ল। বলল, "সর্বনাশ!"

দানু তেরছা চোখে লোকটাকে দেখে নিয়ে বলল, "কেন হে, সর্বনাশের কী হল?"

লোকটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "কে কিনেছে বলতে পারেন?"

"তা কে জানে! কত খদ্দের আসে, আমি কি সবার নাম-ঠিকানা লিখে রাখি?"

"আহা, চেহারাটা কেমন সেটা তো বলতে পারেন!"

"চেহারারই বা ঠিক কী? হাটে কত লোক, সকলের চেহারা আলাদা করে মনে রাখা কি সোজা? আমি বুড়োমানুষ, চোখেরও জোর নেই, মনেও থাকে না।"

"সর্বনাশ হয়ে যাবে মশাই, একেবারে সর্বনাশ। আচ্ছা, লোকটার বয়স কত?"

"চব্বিশ-পঁচিশ হবে বোধ হয়।"

"ফরসা না কালো?"

"ফরসার দিকেই।"

"ইয়ে, তার নামটা কি মনে আছে?"

"না হে বাপু, ওসব মনেটনে নেই।" বেঁটে লোকটা ভারী বিমর্ষ হয়ে চারদিকে হতাশভাবে একবার তাকিয়ে গুটিগুটি চলে গেল।

দানু নির্বিকার বসে রইল। আরও আধঘণ্টা বাদে বেশ মুশকো চেহারার একটা লোক এসে হাজির। এ-লোকটাই পাঁচশো টাকা দর দিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল দানুর।

লোকটা এসেই কোটের ভেতরের পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট বের করে হাজার টাকা গুনে দানুর দিকে বাড়িয়ে বলল, "দিন দাদু, বাক্সটা দিন। হাজার টাকাই দিচ্ছি।"

দানু বিরক্ত হয়ে বলে, "আর হাজার টাকা দেখিয়ে লাভ নেই। বাক্স বিক্রি হয়ে গেছে।"

লোকটা চোখ পাকিয়ে বলে, "তার মানে?"

দানু তেতো গলায় বলে, "বাংলা ভাষাতেই তো কথা বলছি বাপু, তাও মানে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কেন? বাক্স বিক্রি হয়ে গেছে।"

লোকটা হঠাৎ চাপা একটা হুংকার দিয়ে বলে, "কে কিনেছে?"

"তার আমি কী জানি? খদ্দেরের ঠিকুজি কুষ্ঠি রাখা তো আমার কাজ নয়।"

"চালাকি করে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছেন না তো!"

দানু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, "এ দোকানে দাম বাড়ানোও হয় না, কমানোও হয় না। যাও বাপু, পথ দ্যাখো।"

লোকটা হঠাৎ একটু হাসল। খুবই রহস্যময় হাসি। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, "আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রতাপগড়ের মেজোকুমার এক রাতে ঘোড়া দাবড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পুরনো গড়ের কাছে তাঁকে বল্লম চালিয়ে খুন করা হয়। মনে পড়ে?"

দানু বিস্ফারিত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে রইল। জবাব দিল না। লোকটা ফের বলল, "গদাধরপুরের মস্ত মহাজন শঙ্কর শেঠকে কীভাবে খুন করা হয়, মনে আছে? জানলা দিয়ে তির ছুঁড়ে।"

দানু বিব্রত হয়ে একটা ঢোক গিলল। তাচ্ছিল্যের ভাবটা উবে গেছে।

"আরও বলব? হবিবপুরের ব্রজেন মাস্টারের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে। কিন্তু সবাই জানে, সে সময়ে মোহিত দাসের সঙ্গে বদ্বীপ্রসাদের মামলায় ব্রজেন মাস্টার ছিল মোহিতের সাক্ষী। সে সাক্ষী দিলে বদ্রীপ্রসাদ অবধারিত হারে। তাই সাক্ষী দেওয়ায় আগের রাতে ব্রজেন মাস্টারকে সাপে কামড়ায়। আসলে সাপে কামড়ায়নি, সাপকে দিয়ে কামড়ানো হয়েছিল।"

দানু ফেজ টুপিটা খুলে ফের পরল। একটু বিড়বিড় করল আপনমনে।

"এসব ভাল ভাল কাজের পেছনে কার হাত ছিল জানেন? মছলন্দপুরের দানু হেস। পুলিশ তাকে কখনও ধরতে পারেনি অ্যারেস্ট করেও প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।"

দানু গলার মাফলারটা খুলে আবার জড়িয়ে নিল। লোকটার চোখে আর চোখ রাখছিল না।

"দানু হেসের আরও গুণের কথা শুনবেন? প্রথম জীবনে চুরি, ডাকাতি ছিনতাই করে সে দু পয়সা কামাত। মোটা টাকা পেলে খুনখারাপি করত। বয়স হওয়ার পর সে চোরাই জিনিসের ব্যবসা খুলেছিল। জীবনেও এসব কাজের জন্য সে কোনও সাজা পায়নি। ভারী চালাক-চতুর ছিল সে। তা বলে ভাববেন না যে, তার শত্রুর অভাব আছে। তাকে পেলে আজও তাকে খুন করার জন্য কিছু লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুঝেছেন?"

দানু মুখটা নিচু করে খানিক বিড়বিড় করল। তারপর লোকটার দিকে না তাকিয়েই বলল, "এত কথা হচ্ছে কেন?"

"বলি বাক্সটা কে কিনেছে?"

"মাধবগঞ্জের সনাতন রায়।"

"কীরকম পোশাক?"

"ধুতি, গায়ে আলোয়ান, কাঁধে সবুজ রঙের ঝোলা ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে বাক্সটা আছে।"

"আলোয়ানের রং কী?"

"নস্যি রঙের।"

"চেহারা?"

"ফরসা, রোগা, লম্বামত। মাথায় কোঁকড়া চুল। নাকের বাঁ পাশে বড় আঁচিল আছে।"

"ঠিক আছে। খুঁজে তাকে পাবই।"

"একটা কথা বাপু।"

"কী কথা?"

"তুমি কে?"

"আমি তোমার যম। সময়মতো তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ভেবো।"

বলে লোকটা চলে গেল। দানু বিফল হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ধীরেসুস্থে দোকান গোটাতে লাগল। না, তার আজ মেজাজটা ভাল নেই।

খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে সনাতনের খিদে পেল। ঝিকরগাছার হাটে এলে রামগোপাল ময়রার দোকানে ছানাবড়া আর রাবড়ি তার বাঁধা। কিন্তু আজ বাক্সটা কিনতে গিয়ে পয়সা সব বেরিয়ে যাওয়ায় সেসব আর খাওয়া হবে না। সে গুটিগুটি তেলেভাজার দোকানের দিকে এগোতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে ভারী অমায়িক চেহারার গোলগাল একজন লোক তার সামনে ফস করে উদয় হয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আরে! মুখোনা যে বড় চেনা চেনা লাগছে! "

সনাতন লোকটাকে ঠাহর করে দেখেও ঠিক চিনতে পারল না। বলল, "আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। কে বলুন তো আপনি?"

"আমাকে চিনলেন না! আমি হলুম পিরগঞ্জের নটবর পাল।"

খানিকক্ষণ ভেবে সনাতন মাথা নেড়ে বলে, "না মশাই, নটবর পাল নামে কাউকে মনে পড়ছে না তো! পিরগঞ্জও আমার চেনা জায়গা নয়।"

"হতে পারে মশাই, খুবই হতে পারে। তবে আমার বড় শালা হল গে কালিকাপুরের দারোগা গণেশ হালদার।"

সনাতন মাথা নেড়ে বলল, " চিনি না।"

"তাও চিনলেন না! তবে বলি মশাই, ঝিকরগাছার হাটে প্রতি পাঁচজন লোকের একজন জানে যে, নটবর পালের তামাক আর ভুসিমালের কারবারে লাখো লাখো টাকা খাটছে মশাই, লাখো লাখো টাকা। তা বলে কি আর মনে সুখ আছে মশাই? কোনও সুখ আছে?"

সনাতন অবাক হয়ে বলে, "তা সুখ নেই কেন?"

"সুখ থাকবে কী করে বলুন! সুখ তো আর চাকরবাকর নয় যে, ডাকলেই জো হুজুর বলে এসে হাজির হবে! আমারটা খাবে কে বলুন তো! কে খাবে আমারটা? আমার ছেলেপুলে

নেই, ওয়ারিশন নেই। আছে শুধু টাকার পাহাড়। তাই তো মাঝে-মাঝে নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে বলি, ওরে নটবর, তোর এই বিষয়সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাবি বাপু? তোর কে আছে?"

"তা মশাই, পুষ্যিপুত্তুর নিলেই তো পারেন।"

এ কথায় লোকটা শিউরে উঠে জিভ কেটে বলল, "ওকথা আর বলবেন না মশাই, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।"

"কেন, কী হয়েছিল?"

"পুষ্যিপুত্তুর নেব বলে সবে মনস্থির করছি, কী করে যে মনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কে জানে মশাই, হঠাৎ পালে পালে আন্ডাগন্ডা সব ছেলেপুলে হাজির হতে লাগল। কোনওটা হাবাগোবা, কোনওটা বদমাশ, কোনওটা মিটমিটে ডান। সব শিখিয়ে-পড়িয়ে আনা মশাই, সব শিখিয়ে-পড়িয়ে আনা। নিজের নাম হয়তো বলল সুজিত দাস, বাপের নাম বলল হারাণচন্দ্র মণ্ডল। এইসব দেখেশুনে ঘেন্না ধরে গেছে মশাই, ঘেন্না ধরে গেছে।"

গায়ে-পড়া নোকটাকে এড়ানোর জন্য সনাতন বলল, "আচ্ছা নটবরবাবু, আলাপ করে বড় খুশি হলাম। এবার তা হলে আমি যাই! বেলাও পড়ে আসছে।"

"আহা, তাড়াহুড়োর কী আছে মশাই, হাড়াহুড়োর কী? হাট হল মস্ত লোকশিক্ষার জায়গা। ভাল-মন্দ, বিষয়ী-বৈরাগী, সাধু-চোর, শাক্ত-বোষ্টম কতরকমের মানুষ আসে এখানে। ঘুরে বেড়ালেই কত কী শেখা যায়।"

সনাতন বিব্রত হয়ে বলে, "আজ্ঞে, তা বটে। তবে কিনা মানুষের তো খিদে-তেষ্টাও পায়।"

লোকটা একগাল হেসে বলে, "বিলক্ষণ! মানুষের শরীর বলে কথা, খিদে-তেষ্টা না পাওয়াই তো আশ্চর্যের বিষয়। কী বলেন?"

"তাই তো বলছি।"

"আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে দুঃখের কথা কী জানেন, খিদে-তেষ্টা আমারও পায়। একসময় পোলাও কালিয়া ছাড়া একবেলা চলত না। হাঁড়ি-হাঁড়ি রসগোল্লা উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন সব বারণ হয়ে গেছে মশাই। সব বারণ। পেঁপে দিয়ে শিং মাছের ঝোল আর মধুপর্কের বাটির এক বাটি ভাত ছাড়া আর পথ্যি নেই।"

"কেন মশাই?"

"ডাক্তাররা শরীরে নানারকম রোগের সন্ধান পেয়েছে। বেশি খেলেই নাকি মৃত্যু অনিবার্য। তাই তো বলছি মশাই, আমার কি দুঃখের শেষ আছে! এত টাকা, এত ঐশ্বর্য, এত খাবারদাবারের আয়োজনের মধ্যে দাঁতে কুটো কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। সেই যে কথায় বলে, সানকিতে বজ্রাঘাত, এ হল তাই। কথাটা কি ঠিক বললুম?"

"বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। এবার আমি আসি তা হলে।"

লোকটা ভারী করুণ মুখ করে তার দিকে চেয়ে থেকে একটু মিয়োনো গলায় বলল, "চলে যাবেন? এত বড় একটা সুযোগ আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেন? আপনাকে তো তেমন পাষণ্ড বলে মনে হয় না!"

সনাতন থতমত খেয়ে বলে, "আজ্ঞে, কোন সুযোগের কথা বলছেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!"

লোকটার চোখ ছলছল করতে লাগল। ধরা গলায় বলল, "সুযোগ বলে সুযোগ! ব্রাহ্মণ ভোজন করালে সাতজন্মের পাপ কেটে যায় মশাই! ভেবেছিলাম আপনাকে পেয়ে সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে খানিকটা পুণ্যি করে নেব! শুধু পুণ্যিই তো নয়। নিজে খেতে পারছি না বলে অন্যকে খাইয়ে আমার একটা সুখ হয়! আর আপনি আমাকে বঞ্চিত করে চলে যেতে চাইছেন!"

সনাতনের একগাল মাছি। সে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আজ্ঞে আপনার খুবই ভুল হচ্ছে। আমি ব্রাহ্মণ নই!"

নটবর পাল একগাল হেসে বলল, "সৎ ব্রাহ্মণরা কি সহজে ধরা দিতে চায়! আর ছলনা করবেন না মশাই, আপনাকে দেখেই চিনেছি।"

"কী মুশকিল! আপনি তো আমার নামটাও জানেন না।"

"নামে কী আসে যায় বলুন। আলু, পটল, মুলো, নাম একটা হলেই হল। ও নিয়ে ভাববেন না। এই তো কাছেই রামগোপালের দোকান। পোটাক রাবড়ি আর কয়েকখানা গরম ছানাবড়া ইচ্ছে করুন, এই অধমকে এটুকু দয়া যে আজ করতেই হবে। ইদানীং পাপের দিকে পাল্লাটা আমার বেশ ঝুলে পড়েছে বলে টের পাচ্ছি, একটু হালকা হতে দিন।"

রামগোপালের রাবড়ি আর ছানাবড়া সনাতনের বড়ই প্রিয় জিনিস। বড় লোভে ফেলে দিল লোকটা। তবু সনাতন আমতা আমতা করে বলে, "কিন্তু মশাই, আমাকে খাওয়ালে আপনার পাপটাপ কাটবে না, এই বলে রাখছি।"

লোকটা হুংকার দিয়ে বলে, "কে বলল কাটবে না! আলবাত কাটবে। পাপের বাবা কাটবে। এই তো ছয় মাস আগে নকুল ভটচামশাইকে এক হাঁড়ি দই আর ছাপ্পান্নটা রসগোল্লা খাওয়ালুম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, দইয়ের হাঁড়ি সাফ হচ্ছে আর শরীরও হালকা হচ্ছে। শেষে যখন রসগোল্লা খাচ্ছেন তখন টপাটপ রসগোল্লা যেই গলা দিয়ে নামছে আমার শরীরটা যেন ফুরফুর করতে লেগেছে। শেষে পাপ যখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাকে ছেড়ে চলে গেল তখন শরীর একেবারে পালকের মতো হালকা, এত হালকা যে মেঝে ছেড়ে দেড় হাত শূন্যে উঠে পড়ল। তখন আমিই ভটচামশাইকে থামালুম, আর না, আর না ভটচামশাই! এরপর যে গ্যাস বেলুনের মতো উড়ে যাব। তা উনি তখন বিরক্ত হয়ে ওই ছাপ্পান্নটাতেই থামলেন। নইলে বিপদ ছিল।

"কী মুশকিল! আমি যে মোটেই বামুন নই। এই দেখুন, আমার গলায় পইতেও নেই।"

লোকটা একগাল হেসে বলে, "চেনা বামুনের পইতে লাগে না। আসুন মশাই, আসুন। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। পাপ কাটে কি না হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সনাতনের ভারী সংকোচ হচ্ছিল। লোকটা পাগলই হবে। তবে সে আর গাঁইগুই করল না। পকেটে পয়সা নেই, খিদেটাও চাগাড় দিয়েছে। ভগবান কখনও সখনও গরিবকে এভাবেই হয়তো অযাচিত সাহায্য করেন।

রামগোপালের রাবড়ি হল সরে দুধে মাখামাখি, ওপরে ননি ভেসে থাকে। মুখে দিলেই মনে হয়, স্বর্গে উঠে গেলাম। লোকটা দিলদরিয়া আছে। একপো রাবড়ি আর দশখানা ছানাবড়া হুকুম দিয়ে বসল।

ভারী লজ্জায় লজ্জায় খাচ্ছিল সনাতন। তবে রামগোপালের রাবড়ি আর ছানাবড়া এতই ভাল জিনিস যে, লজ্জা সংকোচ বজায় রাখা কঠিন।

সনাতন খাচ্ছে আর নটবর সামনে বসে 'আহা, উঁহু' করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বলছে, "আহা, বেশ রসিয়ে রসিয়ে খান তো মশাই, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বেশ গুছিয়ে ধীরেসুস্থে জিবে টাগরায় মাখিয়ে নিয়ে খেতে থাকুন।"

সনাতন বলল, "সেই চেষ্টাই তো করছি মশাই, কিন্তু রাবড়িটা যে জিবে গিয়েই হড়কে যাচ্ছে।"

"তা হলে আর একপো দিতে বলে দিই।"

"পাগল নাকি?"

"আপনার তো দেখছি পাখির আহার! না মশাই, আপনাকে খাইয়ে সুখ নেই। গেল হপ্তায় এই দোকানে বসেই বিপিন বিশ্বাসকে খাইয়েছিলাম, বললে বিশ্বাস করবেন না, দেড়

সের রাবড়ি আর পঞ্চান্নটা ছানাবড়া চোখের পলকে উড়িয়ে দিল। ক্ষণজন্মা পুরুষ মশাই, সব ক্ষণজন্মা পুরুষ।”

খাওয়া শেষ হওয়ার পর নটবর পকেট থেকে একখানা রুপোর ডিবে বের করে বলল, “আমার মায়ের হাতে সাজা বেনারসি পাত্তির পান। এক খিলি ইচ্ছে করুন, দেখবেন মনটা ভারী ফুরফুরে হয়ে যাবে। মিষ্টি মশলা দেওয়া আছে।”

সনাতন হাত বাড়িয়ে পানটা নিয়ে মুখে পুরতে যাবে ঠিক এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। একটা মুশকো চেহারার লোক ঝড়ের বেগে দোকানে ঢুকে সটান তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, “নিশিকান্ত! এটা কী ব্যাপার? কুমার বাহাদুরের শিকার তুমি কোন সাহসে দখল করে বসে আছ? তোমার ঘাড়ে ক’টা মাথা?”

নটবর পালের বিনয়ের ভাবটা হঠাৎ উবে গেল। গলাটাও হয়ে উঠল ভারী গমগমে। হুংকার দিয়ে বলল, “আমি কে সেটা ভুলে যেয়ো না গদাধর। আমি কিংশুক গিরির ম্যানেজার।

“এ জিনিসের ওপর কিংশুক গিরির কোনও অধিকার নেই, ধর্মত ন্যায্যত ওটা কুমার বাহাদুরের পাওনা। ওই বাক্সের জন্য বহু খুনখারাপি হয়ে গেছে নিশিকান্ত, আরও কয়েকটা হলেও কুমার বাহাদুর পিছপা হবেন না।”

“বটে!” বলে নটবর পাল লাফিয়ে উঠে বলল, “তবে তাই হোক। আমিও তৈরি হয়েই এসেছি। বাইরে আমার দলবল রয়েছে।”

“দ্যাখো নিশিকান্ত, তুমি ভালই জানো যে, লড়াই হলে তুমি উড়ে যাবে। কুমার বাহাদুর রক্তপাত পছন্দ করেন না। তুমি ভালয় ভালয়

সরে পড়ো। আমি এ-লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।”

নটবর রুখে উঠে বলল, “খবরদার বলছি গদাধর। একদম ওসব চেষ্টা কোরো না।”

“তবে রে!” বলে গদাধর লাফিয়ে পড়ল নটবরের ঘাড়ে। নটবরও বড় কম যায় না। দেখা গেল সেও বিদ্যুৎগতিতে পাশে সরে গিয়ে লোকটার ঘাড়ে একখানা রদ্দা বসিয়ে দিল।

তারপর দুজনে চেয়ার টেবিল উলটে গেলাস পিরিচ ভেঙে ধুন্ধুমার লড়াই করতে লেগে গেল।

সনাতন দেখল, এই সুযোগ। মারপিট দেখতে লোকজন জড়ো হয়ে যাওয়ায় তার সুবিধেও হয়ে গেল খুব। সে উঠে পড়ি-কি-মরি করে বেরিয়ে ছুটতে লাগল।

তার মনে হল, চারদিক থেকে হঠাৎ একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এবং তার মূলে আছে সদ্য কেনা কাঠের বাক্সটা।

৩. তেমন দায়ে পড়লে দুর্গা মালো

তেমন দায়ে পড়লে দুর্গা মালো খুনখারাপি রক্তপাত করে বটে, কিন্তু তা বলে খুনটুন করতে সে ভালবাসে না। বিনা হাঙ্গামায় কার্যোদ্ধার হলেই সে খুশিই হয়, কিন্তু মুশকিলও সেইখানে। দুর্গা মালোর মাথায় তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। সূক্ষ্ম হাতের কাজেও সে দড় নয়। সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকার ধৈর্যও তার নেই। হাত সাফাইকারীদের মহলে তাই তার খুব বদনাম। সবাই বলে, দুর্গা মালোর হচ্ছে মোটা দাগের কাজ। এ-লাইনে তার গুরু হল পঞ্চানন পুততুণ্ড। পঞ্চাননও দুঃখ করে বলে, আমার চেলাদের মধ্যে দুর্গাটারই মাথা বড্ড মোটা। যত্ন করে সব শেখালাম, কিন্তু কিছুই তেমন শিখতে পারল না।

নিজের মধ্যে প্রতিভার অভাবটা দুর্গাও টের পায়। তাই সেটা সে গায়ের জোরেই পুষিয়ে নেয়।

মাধব পণ্ডিতের ট্যাঁক-ঘড়িটার কথাই ধরা যাক। কোমরে একটা রুপোর গোটের সঙ্গে চেন দিয়ে ঝোলানো থাকে। ইয়া বড় ঘড়ি। কোন

আদ্যিকালের কে জানে! এতকাল কারও নজরেও পড়েনি তেমন।

যুধিষ্ঠির বর্মনের বন্ধকি কারবার। একদিন দুর্গাকে ডেকে বলল, "মাধব পণ্ডিতের ট্যাঁক-ঘড়িটা যদি এনে দিতে পারিস তা হলে পঞ্চাশটা টাকা দেব।"

পঞ্চাশ টাকা শুনে দুর্গার মাথায় টিকটিকি ডেকে উঠল। মাধব পণ্ডিতের ট্যাঁক-ঘড়ির যে কোনও দাম আছে সেটাই তো কখনও মনে হয়নি। তাই দুর্গা মালোদর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "পঞ্চাশ টাকায় হবে না। একশো টাকা কবুল করলে এনে দেব।"

যুধিষ্ঠির গাঁইগুই করতে লাগল। অবশেষে রাজি হল বটে, কিন্তু হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল, "খবরদার, মাধব পণ্ডিত যেন টের না পায়। হাল্লাচিল্লা, মারদাঙ্গার কাজ নয় বাপু। খুব সাবধানে কৌশলে কাজ হাসিল করা চাই।"

দুর্গা মালো ওস্তাদজিকে স্মরণ করে নেমেও পড়ল কাজে। হাতসাফাইয়ের বিস্তর তালিম নেওয়া আছে, কাজটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। কাটার যন্ত্র দিয়ে কোমরের রুপোর গোটটা কেটে ফেললেই হল। তারপর টুক করে টেনে নেওয়া। রুপোর গোটটা বেচেও কিছু পাওয়া যাবে।

মওকাও পাওয়া গেল জব্বর। গাঙপুরের গোঁসাই বাড়িতে কীর্তনের আসরে মাধব পণ্ডিত হল মধ্যমণি। কীর্তনটা গায়ও ভাল। আসরে ঢুকে অনেকের সঙ্গে দুর্গাও "হরিবোল হরিবোল" করে দু'হাত তুলে খানিকক্ষণ নাচল। মাধব পণ্ডিতের যখন বিভোর অবস্থা তখন সুযোগ বুঝে কোমরের গোটে কাটার ঢুকিয়ে কাটতে যাবে,

ঠিক সেই সময়ে মাধব পণ্ডিত "বাবা রে, গেছি রে" বলে এমন চেঁচামেচি জুড়ল যে, বলার নয়! হাতসই না হওয়ায় একটু খোঁচা লেগেছিল বটে, একটু রক্তপাতও হয়েছিল। কিন্তু তা বলে চেঁচামেচি করার কোনও মানে হয়? ভক্তিভাব এলে মানুষ যখন উঁচুতে উঠে যায় তখন কি তুচ্ছ বিষয়আশয় বা শরীরের ব্যথা বেদনার কথা খেয়াল থাকে? নাকি থাকাটা উচিত? ছ্যাঃ ছ্যাঃ, কলিকালে ভক্তিভাবটাবগুলোও রামলাখন গয়লার দুধের মতো জলমেশানো জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমন ভক্তিভাব হলে গলাখানা কেটে ফেললেও টের পাওয়ার কথা নয়। অমন সুযোগটা মাঠে মারা গেল।

তাই তখন বাধ্য হয়েই রাতের দিকে যখন কীর্তনের পর মাধব পণ্ডিত একা বাড়ি ফিরছিল তখন দুর্গা মুখোনা গামছায় ঢেকে তার ওপর চড়াও হল। মাথায় ডান্ডা মেরে ফেলে দিয়ে ঘড়ি আর গোট কেড়ে নিতে হল। মোটা দাগের কাঁচা কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গাই বা করে কী?

কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘটনা শুনে আঁতকে উঠে বলল, "করেছিস কী সব্বোনেশে কাণ্ড? মাধব পণ্ডিতের ছোট জামাই যে মণিরামপুরের দারোগা! যা যা, দূর হয়ে যা, ও ঘড়ি আমি আর ছোঁবও না। তল্লাট জুড়ে এখন পুলিশের হামলা হবে।"

সেই শুনে দুর্গারও পিলে চমকাল। পরদিন গভীর রাতে গিয়ে মাধব পণ্ডিতের ঘরের জানালা দিয়ে ঘড়ি আর গোট রেখে এল।

তার হাতে সূক্ষ্ম কাজ হয় না বটে, কিন্তু তা বলে চেষ্টার সে কোনও ত্রুটি করে না। প্রথমটায় হাতসাফাইয়ের চেষ্টাই সে করে। তাতে কার্যোদ্ধার না হলে মোটা দাগের পন্থা নেয়।

আজকের কাজটিও সূক্ষ্মভাবেই হাসিল করার চেষ্টা করছে দুর্গা। রাজা গজার মতো চেহারার যে লোকটার পিছু নিয়ে সে ঘুরছে তার সর্বাঙ্গে যেন টাকার বিজ্ঞাপন। পকেটে পাঁচ-দশ হাজার নগদ, গলায় মোটা সোনার চেন, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, আঙুলে গোটাসাতেক হিরে, মুক্তো, চুনি, পান্নার আংটি। একুনে প্রায় লাখ টাকার মাল তো হবেই।

লোকটার পিছু পিছুই ভজহরির ম্যাজিক শোতে ঢুকে পড়েছে দুর্গা। তারপর সামনের সারিতে বসা লোটার ঠিক পেছনেই ঘাপটি মেরে বসেছে।

স্টেজের ওপর ভজহরি তার এলেবেলে মামুলি খেলাগুলো দেখিয়ে যাচ্ছে। খুব মন দিয়ে দেখছে লোকটা। বাহ্যজ্ঞান নেই। স্টেজের ওপর ভজহরি তার এক শাগরেদকে লম্বামতো একটা বাক্সে পুরে বাক্সটা করাত দিয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে কাটছে।

খুব মোলায়েম হাতে লোকটার পাঞ্জাবির বাঁ পকেট থেকে টাকার গোছাটা বের করে নিল। লোকটা টেরও পেল না। দুর্গা এরপর একটু অপেক্ষা করল। ভজহরি বাক্সটা কেটে ফেলেছে। এমনভাবে কেটেছে যে, বাক্সের সঙ্গে তার শাগরেদেরও কেটে দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাই কি হয়? ভজহরি বাক্সটা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকেই ঢাকনাটা সরিয়ে নিল। শাগরেদ লাফিয়ে উঠে সবাইকে সেলাম জানাতে লাগল। আর

তুমুল হাততালি উঠল চারদিকে। আর সেই হাততালির মধ্যেই দুর্গা খুব নরম হাতে কাটারটা ধরে লোকটার গলার চেনটা কট করে কেটে ফেলে টেনে নিল। এ কাজটা অবশ্য খুব সূক্ষ্ম হল না। দুর্গার মনে হল হারটা কাটবার সময় কাটারটার একটা খোঁচা লেগেছে লোকটার গলায়। কিন্তু খেলা দেখে লোকটা এতই মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছিল যে, খোঁচাটা খেয়ালই করল না। এরকম ক্ষণজন্মা পুরুষ না হলে কি কাজ করে সুখ!

ভজহরি এরপর একটা খালি টুপির ভেতর থেকে প্রথমে তিনটে পায়রা আর তারপর তিন তিনটে খরগোশ বের করল। লোকটা খুব মন দিয়ে খেলা দেখছে। দেখতে দেখতে আনমনে হাতের আংটিগুলো একটা একটা করে খুলছে আর পরছে, খুলছে আর পরছে। অনেকের এরকম চঞ্চল স্বভাব আছে বটে। দুর্গা খুব ঠাহর করে ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগল। শেষ অবধি লোকটা আংটিগুলো খুলেই ফেলল। তারপর অবহেলাভরে পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে রেখে দিল।

আহা, দেশটায় যে কেন এরকম লোক আরও অনেক জন্মায় না কে জানে! দুর্গা ফের ওস্তাদজিকে স্মরণ করে খুব মোলায়েম হাতে আংটিগুলো বের করে নিল। এত চমৎকার ভাবে কাজ হাসিল হয়ে যাচ্ছে দেখে দুর্গা নিজেও অবাক।

আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে ভেবে দুর্গা উঠে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময়ে ভজহরি তার পরের খেলা শুরু করেছে। তার এক শাগরেদকে একটা কাঠের তক্তার গায়ে দাঁড় করিয়ে ভজহরি চোখ বেঁধে একের পর এক ছোরা ছুঁড়ে মারতে লাগল আর সেগুলো সাঁত সাঁত করে গিয়ে শাগরেদের শরীর ঘেঁষে তক্তায় গেঁথে যেতে লাগল।

এই খেলা দেখে লোকটা এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, “উঃ বড় গরম লাগছে তো,” বলে গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে পাশের খালি জায়গাটায় রেখে দিল।

ভগবান যখন দেন তখন এভাবেই দেন। দিয়ে যেন আশ মেটে। দিতে দিতে যেন ভগবানের একেবারে খুন চেপে যায়। নিতে না চাইলেও জোর করে যেন গছাবেনই।

ভগবানকে চটাতে যাবে কোন আহাম্মক? দুর্গা তাই পাঞ্জাবি থেকে চটপট বোতাম খুলে নিল।

এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বহুকাল সে কোনও কাজ হাসিল করতে পারেনি। গৌরবে বুকখানা ভরে উঠল তার। দুঃখ এই, তার বন্ধুরা কেউ দেখতে পেল না, পেলে বুঝত দুর্গা সূক্ষ্ম হাতের কাজেও বড় কম যায় না!

কে যেন চাপা গলায় পেছন থেকে বলে উঠল, "সাবধান!" দুর্গা পট করে পেছনে তাকাল। গায়ে গায়ে অনেক লোক বসে ম্যাজিক দেখছে তন্ময় হয়ে। অন্ধকার বলে কারও মুখ ঠাহর হয় না! ম্যাজিক দেখেই বোধ হয় কেউ বাহবা দিল। যাক, তার কাজ হয়ে গেছে। এবার কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

জিনিসগুলো গামছায় বেঁধে নিয়ে উঠতে যেতেই পেছন থেকে কে যেন চাপা গলায় বলল, "ভজহরি তো তোমার কাছে নস্যি হে। যা হাতের কাজ দেখালে! আহা! চোখ জুড়িয়ে যায়।"

দুর্গা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কেউ দেখে ফেলেছে নাকি? তা হলে তো আবার সাক্ষীও জুটল।

কাছেপিঠে থেকে আরও একজন চাপা গলায় বলল, "অর্ধেক কাজ করে যাও কোথা হে! হাতঘড়িটা রইল যে! আসল সোনার ঘড়ি, মেলা দাম।"

দুর্গার অস্বস্তি বাড়ল। পেছনের লোকগুলো কি ভজহরির খেলা ছেড়ে এতক্ষণ তার খেলা দেখছিল নাকি রে বাবা? তা হলে তো ভারী লজ্জার কথা! দুর্গা ভিড়ের ভেতর দিয়েই পথ করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। কাজটা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বড্ড কিন্তু কিন্তু লাগছে দুর্গার। আজ অবধি সে এত পরিষ্কার হাতে কখনও কোনও কাজ করে উঠতে পারেনি। কিন্তু কাজটা করে উঠে তেমন স্বস্তি বোধ করছে না তো!

বেরিয়ে এসে দুর্গা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, হঠাৎ কোথা থেকে একজন টেকো মাঝবয়সি লোক সেঁতো হাসি হাসতে হাসতে এসে পট করে তার গলায় একটা গাঁদার মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, "অভিনন্দন! অভিনন্দন!"

দুর্গা আঁতকে উঠে বলে, "এসব কী ব্যাপার?"

লোকটা ভারী অমায়িক গলায় বলে, "এ হল গুণী মানুষের সম্মান। এত বড় একজন ওস্তাদ লোককে সম্মান জানানো তো দেশ আর দশের কর্তব্যই হে! তাই না?"

দুর্গা মালো প্রমাদ গুনল। তার মন কু ডাক ডাকতে লেগেছে। এসব যা হচ্ছে তা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এর মধ্যে যে গভীর ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হচ্ছে তার!

হঠাৎ দুর্গা পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় কেউ তাকে তাড়াও করল না, ধর, ধর বলে শোরগোলও তুলল না। তাতে ভয়টা আরও বেড়ে গেল দুর্গার। সে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

৪. ঝিকরগাছার হাটে ঘুরে বেড়ানো

নাঃ, ঝিকরগাছার হাটে আজ ঘুরে বেড়ানোই সার হল। কিছুই ঘটল না তেমন। জম্পেশ কিছু একটা না ঘটলে এই হাটেবাজারে আসার সুখটাই থাকে না কিনা। ঘুরে ঘুরে নবকান্ত ভারী হেদিয়ে পড়ছিল।

সেই চোত মাসের দ্বিতীয় হপ্তায় একবার আগুন লেগেছিল হাটে। আহা, কী দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। আগুন বাবাজীবন কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে দরমা আর তেরপলের দোকানগুলো গপাগপ সাবাড় করছিল। লহমায় উত্তর দিকটা সাফ হয়ে গেল একেবারে। আর আগুনেরও বাহার কী! যেমন রাঙা রংখানা, তেমনই তেজ! তেমনটি আর দেখল না নবকান্ত আজ অবধি। আগুনের হলকা না হোক খাট-সত্তর ফুট উঁচুতে উঠেছিল।

বোশেখটাও খারাপ যায়নি। সংক্রান্তির আগের দিনই হবে। ঝিকরগাছার জমজমাট হাটের মধ্যে শিবের ষাঁড় কেলো-হাবুকে কে যেন খেপিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর ওঃ! সে কী লন্ডভন্ড কাণ্ডটাই না হল! প্রথমেই উড়ে গেল পটলওলা গদাই দাস। চারদিকে পটলগুলো যেন বন্যার মতো ঢেউ খেলে ছড়িয়ে পড়ছিল। ক্ষ্যামা নন্দীর আলুর পাইকারি কারবার। বিরাট দাঁড়িপাল্লায় পেল্লায় পেল্লায় বস্তা ওজন হচ্ছিল। কেলোহাবুর গুতোয় বস্তাসুদ্দু আলু শূন্যে উঠে চারদিকে শিলাবৃষ্টির মতো আলু ঝরে পড়তে লাগল। কানা বোষ্টম হরেন গোঁসাই নিতাই খ্যাপার গান গেয়ে তোক জমাচ্ছিল। তা বোষ্টমের পো কেলো-হাবুর গুঁতায় উড়ে গিয়ে পড়ল নিধিরামের দোকানের চালে। ছুটে পালাতে গিয়ে জ্ঞান মাস্টারের ধুতি খুলে নিশানের মতো উড়তে লাগল। নবকৃষ্ণের জিলিপির কড়াই উলটে সারা গায়ে ফোঁসকা। কত লোকের যে উলটোপালটা পালাতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে হাত পা ভেঙেছিল, তার লেখাজোখা নেই। আহা, দেখেও সুখ।

তারপর মাস দুই বড্ড মন্দা গেছে বটে। কিন্তু শ্রাবণ মাসেই ফের ঝিকরগাছার মেলায় লেগে গেল ধুন্ধুমার। ষষ্ঠীপুরের ছেলেদের সঙ্গে কালীগঞ্জের ছেলেদের সে কী মারপিট!

কী না, ষষ্ঠীপুরের পন্টু নাকি কালীগঞ্জের জগুকে ‘রাঙামুলো’ বলেছিল। তাই থেকেই ঝগড়া। ঝগড়া থেকে মারপিট। তারপর মারপিট থেকে প্রায় দাঙ্গা। বিনা কারণেই হাটের লোকেরা কেউ ষষ্ঠীপুরের পক্ষ নিয়ে, কেউ বা কালীগঞ্জের পক্ষ নিয়ে যাকে-তাকে ধরে পেটাতে লাগল। তারপর কে যে কাকে পেটাচ্ছে আর কেন পেটাচ্ছে তা নিজেরাও বুঝতে পারছিল না। ওঃ সে যা কাণ্ড হয়েছিল একখানা কহতব্য নয়! তবে হ্যাঁ, যাত্রা, থিয়েটার, কবির লড়াই কিছুই এর কাছে লাগে না। দু’ চোখ ভরে শুধু দেখে যাও।

পুজোর মাসটা বাদ দিয়ে কার্তিকের পয়লা হপ্তাতেই কাণ্ডটা কিছু খারাপ হল না। সাতটা থানার হৃৎকম্প তুলে বিখ্যাত ডাকাত নেলো চারদিকে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তাতে গেরস্তর রাতের ঘুম বলে কিছু ছিল না। দারোগা-পুলিশ তার কিছু করতে পারত না। কত মোটাসোটা দারোগা শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছিল দুশ্চিন্তায়। তা সেই নেলো কার্তিক মাসের পয়লা হাটবারে কেন যে মরতে ঝিকরগাছার হাটে এসেছিল কে জানে!মতিভ্রমই হবে। শোনা যায়, সে নাকি মেয়ের জন্য ডায়মন্ডকাটা পুঁতির মালার সন্ধানে ঝিকরগাছায় হাজির হয়।

ওদিকে পুলিশের আড়কাঠিরা খবর পৌঁছে দিয়েছে থানায়। সাতটা থানার পুলিশ আর দারোগা এসে হাট ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু মুশকিল হল তারা কেউ নেলোকে চাক্ষুষ চেনে না। লম্বাচওড়া লোক দেখলেই নেলো মনে করে টপাটপ বেঁধে ফেলছে। প্রথমেই ধরা পড়ে গেলেন মহেশতলা হাই স্কুলের ড্রিল-সার। যতই চেঁচামেচি করেন ততই পুলিশ তাঁকে আরও শক্ত করে বাঁধে। গজেনবাবু সাতে-পাঁচে নেই, উবু হয়ে বসে বেগুন কিনছিলেন। পুলিশ তাঁকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গোরুর গাড়িতে তুলে চালান দিল। ব্যায়ামবীর নন্দদুলাল কর্মকার পেশি প্রদর্শনীতে নাম দেবে বলে এসে পুলিশের হাতে কী নাকালটাই হল! ব্যায়ামবীর হলে কী হয়, নন্দদুলাল ভারী ভিতু মানুষ। পুলিশে ধরতেই কেঁদেকেটে একশা। তাইতে পুলিশের সন্দেহ আরও ঘোরালো হল তার ওপর। রুল দিয়ে কী গুঁতোই দিচ্ছিল সবাই মিলে। আহা, দেখেও সুখ! শেষ অবধি প্রায় দেড়শো

নকল নেলোকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। পরে জানা গেল আসল নেলো নাকি মোটে পাঁচ ফুটের বেশি লম্বাই নয়। আর ভারী রোগাভোগা নিরীহ চেহারার মানুষ।

তারপর অগ্রহায়ণ গিয়ে এই পৌষ চলছে। কিন্তু গা গরম হওয়ার মতো ঘটনাই ঘটছে না মোটে। গত হপ্তায় নরেন ঘোষের সঙ্গে সাতকড়ি নন্দীর একখানা ঝগড়া হয়েছিল বটে। সাতকড়ি ঝগড়ায় বড্ড ভাল। এমন মোক্ষম কথা কইবে যে, কান জুড়িয়ে যায়। কিন্তু নরেন ঘোষটা কাজের নয়। রেগে গেলে তোতলাতে থাকে, চোখমুখ রাঙা হয়ে যায়। ওরে বাপু, ঝগড়াও তো একটা আর্ট, না কি! মাথাটি ঠান্ডা রেখে পাটে পাটে কথা কইতে হয়, তার মধ্যেই হুল দিতে হয় মিষ্টি করে। গলার ওঠাপড়াও এক এক জায়গায় এক এক রকমের হওয়া চাই। তা দেখা গেল নরেন ঘোষের ঝগড়ায় এখনও অন্নপ্রাশনটাই হয়নি। দু-চার কথার পরই রণে ভঙ্গ দিল। ধুস! ভাল ভাল চর্চা সবই উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে!

হরেকেষ্টর জিলিপি আর গোরা ময়রার বোঁদে, এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে। ঝিকরগাছার হাটে এলে একবার জিলিপি, অন্যবার বোঁদে নবকান্তর বাঁধা। ঘুরে ঘুরে খিদেটা চাগাড় দেওয়ায় নবকান্ত গোরা ময়রার দোকানের দিকে গুটিগুটি এগোচ্ছিল। আজ বোঁদে।

হঠাৎ উদভ্রান্ত চেহারার অল্পবয়সি একটা ছোঁকরা ঝড়ের বেগে এসে তার পথ আটকে বলল, “মশাই, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন? আমার বড় বিপদ।”

বিপদের কথায় ভারী খুশি হয়ে নবকান্ত বলল, “বাঃ, বাঃ, এ তো খুব ভাল কথা! তা কী বিপদ বেশ খোলসা করে বলো তো!”

ছোঁকরা মাথা নেড়ে বলল, “বলার সময় নেই। এই বাক্সখানা দয়া করে চাঁদরের তলায় ঢুকিয়ে নিন।”

বলেই তার হাতে একটা ভারী কাঠের বাক্স প্রায় জোর করেই গুঁজে দিয়ে বলল, “আমার নাম সনাতন রায়। মাধবগঞ্জে বাড়ি। দয়া করে নামটা মনে রাখবেন।”

বলেই ছোঁকরা ফের ঝড়ের বেগেই উধাও হল।

নবকান্তর একগাল মাছি। ব্যাপারটার মাথামুন্ডু সে কিছুই বুঝতে পারল না। তবে তার কাণ্ডজ্ঞান আছে। সে বুঝল, ব্যাপারটা যাই হোক, তার রহস্যটা এই বাক্সর মধ্যেই ঘাপটি মেরে সেঁদিয়ে রয়েছে। নবকান্ত এদিক-সেদিক চেয়ে বাক্সখানা চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিল।

গোরা ময়রার বোঁদের চেহারা যেমন মুক্তোর মতো, স্বাদেও তেমনই। কিন্তু আজ নবকান্ত তেমন স্বাদ পাচ্ছিল না। আনমনে খেয়ে যাচ্ছিল মাত্র। কোলে চাঁদর ঢাকা দেওয়া কাঠের ভারী বাক্সটা। দুশ্চিন্তা সেটা নিয়েই। ছোঁকরা বলছিল যে, তার বড় বিপদ। তা বিপদ যদি এই বাক্সখানার জন্যই হয়, তা হলে সেই বিপদ আবার নবকান্তকেও তাড়া করতে পারে। চোখের সামনে ঘটনা ঘটতে দেখলে নবকান্ত খুশি হয় বটে, কিন্তু তা বলে ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে সে মোটেই ভালবাসে না।

"শ্যামাপদ যে!" বলে একটা বেঁটে মতো, টেকো লোক গদগদ মুখে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

বড্ড অন্যমনস্ক ছিল বলে নবকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইল।

লোকটা বড় বড় দাঁত বের করে গ্যালগ্যাল করে হেসে বলল, "জেল থেকে পালিয়ে এয়েছ শুনলাম। শুনে ইস্তক বড্ড খুশি হয়েছি। তা পালাবে না-ই বা কেন? জেলখানা কি আর ভাল জায়গা! সব কয়েদিরই উচিত জেল থেকে পালিয়ে আসা। সেইজন্যই তো মুনিঋষিরা বলে গেছেন, কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফ্যাল কররে লোপাট।"

নবকান্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলে, "কী বলছেন আমি তো তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আহা, ভয় পেয়ো না ভায়া। আমি তো আর পাঁচ কান করতে যাচ্ছি না। আমি তেমন লোক নই যে, পুলিশকে খবর দিয়ে তোমাকে ফের ধরিয়ে দেব। পুলিশ তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে বটে, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে টু শব্দটিও বেরোবে না।"

নবকান্ত চটে উঠে বলল, "পুলিশ! পুলিশ আমাকে খুঁজবে কেন মশাই?"

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "আহা, ওইটেই তো পুলিশের দোষ। জেল থেকে পালালে এমন কী দোষ হয় বাপু, তাও তো বুঝি না। কী সুখের জায়গা সেটা শুনি! বিছানায় ছারপোকা, মশার কামড়, ইঁদুর, আরশোলার উৎপাত, তার ওপর খাওয়ার যা ছিরি! লপসি আর ঘ্যাঁট। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, জেলখানা কি একটা থাকার মতো জায়গা হল বাপু? না হয় মুকুন্দপুরের শীতল দাসকে তুমি খুনই করেছ, কিন্তু তাতে কী? শীতল দাসও তো আর সাধুসজ্জন ছিল না! তার পাপের ফিরিস্তখানাও তো কম লম্বা নয়। খুনটা করে দেশের একরকম উপকারই তো করেছ হে!"

নবকান্ত দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "শীতল দাসকে খুন করেছি কিনা জানি না মশাই, তবে এখন আমার একটা লোককে খুন করতে খুব ইচ্ছে করছে। আর সেই লোকটা আপনি।"

যেন ঠাট্টার কথা শুনছে এমনভাবে হেঃ হেঃ করে হেসে লোকটা বলল, "ওইটেই তো তোমার দোষ শ্যামাপদ। এমনিতে তো তুমি লোক খারাপ নও। আমরা তো বলি, শ্যামাপদর মাথাটি ঠান্ডা থাকলে সে একেবারে গঙ্গাজল, আর মাথা গরম হলে সে মুচির কুকুর। রাগটা সামাল দিতে পারো না বলেই না এই অবধি সাতটা না আটটা খুন করে ফেলেছ। দু-একটা বেশি কম হতে পারে, সেটা ধরছি না। তা যাকগে ভাই, সেসব কথা বাদ দাও। কিন্তু জেলখানার মতো বিচ্ছিরি জায়গা থেকে যে বেরিয়ে এসেছ তা দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। তা তোমার কাঁকালে চাঁদরে ঢাকা ওটি কী বলো তো! ক্যাশবাক্স মনে হচ্ছে।"

নবকান্ত হুংকার দিয়ে বলল, "কে বলেছে ক্যাশবাক্স?"

"তা বাপু, ক্যাশবাক্স কি আর খারাপ জিনিস? টক করে অমন রেগে যাও কেন বলো তো! হাটে এসে যদি কারও ক্যাশবাক্স হাতিয়েই নিয়ে থাক, তা হলে অন্যায়টাই বা কী হয়েছে বলো! ওসব একটু-আধটু না করলে তোমার চলবেই বা কীসে? জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছ, এখন পয়সাকড়ি না হলে চলে! আমি তো এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখছি না। তা কেমন পেলে ক্যাশবাক্সে, দু-চার হাজার টাকা হবে না?"

নোকটা বেশ গলা তুলেই কথা কইছে, ফলে আশপাশের লোক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। নবকান্ত প্রমাদ গুনল।

লোকটা খুব গ্যাল গ্যাল করে হেসে বলে, "তোমার নজর বরাবরই উঁচু। ছোটখাটো কাজ করার লোক তুমি নও। মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। তা আস্ত একখানা ক্যাশবাক্সই যদি লুট করলে তবে গোরা ময়রার বোঁদে কেন? শেফালি কেবিনের মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস কী দোষ করল হে শ্যামাপদ?"

"আমি শ্যামাপদ নই, আপনি ভুল করছেন।"

"আহা, এই পরিস্থিতিতে যে নামধাম পালটে ফেলতে হয়, তা কি আর আমি জানি না? তা নতুন নামটা কী নিলে হে? বেশ ভাল দেখে একটা নাম নিয়েছ তো!"

নবকান্ত বুঝতে পারছিল, আর দেরি করা ঠিক হবে না। বোঁদের দামটা টেবিলে রেখে সে টক করে উঠে পড়ল।

"চললে নাকি হে শ্যামাপদ? তা এসো গিয়ে। সব ভাল যার শেষ ভাল।"

নবকান্ত বেরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল।

৫. রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে

সকালবেলাটায় রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে ঘুমোচ্ছিলেন। বুড়ো বয়সের ওইটাই দোষ। যখন-তখন ঘুম পেয়ে যায়। সিংহাসনটার অবস্থা অবশ্য খুবই খারাপ। কাঠের ওপর পেতলের পাত লাগানো ছিল। সেগুলো পুরনো হয়ে উঠে যাচ্ছে, গদির ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। ছারপোকার উপদ্রবও আছে খুব। বসলে মোটেই আরাম হয় না, বরং অসাবধান হলে ভাঙা পেতলের পাতে কিংবা উঠে-থাকা পেরেকে খোঁচা লাগে, গদির ছোবড়া কুটকুট। করে। তবু মহেন্দ্র বেশ আরাম করে গুটিসুটি হয়ে বসে রোজই ঘুমিয়ে পড়েন।

ঘুমের একটা সুবিধের দিকও আছে। অভাব-অভিযোগ শুনতে হয় না। একটু আগেই রানিমা এসে লম্বা ফিরিস্তি শুনিয়ে গেলেন, সরষের তেল বাড়ন্ত, গয়লার টাকা না মেটালে দুধ বন্ধ করে দেবে, মুদির দোকানে তিনশো টাকার ওপর ধার, ঠিকে-লোক কাজ করতে চাইছেনা, দক্ষিণের ঘরে দেওয়ালের চাপড়া খসে পড়েছে, ইত্যাদি।

আজ সবে ঘুমটা এসেছে, হঠাৎ-দু চারজন প্রজা এসে হাজির। ফটিক রায় এসে বলল, “মহারাজ, তামা-তুলসী ছুঁয়ে বলতে পারি, জীবনে কখনও রাজবাড়ির কুটোগাছটিতেও হাত দিইনি। কিন্তু রাজকুমার তার দলবল নিয়ে গিয়ে কী হেনস্থাটাই করল আমাকে পাঁচজনের সামনে। আমার বউয়ের গলার বিচেহারটা নাকি রানিমার বাপের বাড়ির দেওয়া জিনিস, আমার বউমার হাতের বালাজোড়া নাকি মহারাজ মহতাবের আমলে বড় রানিমা পরতেন। তা ছাড়া কাঁসার বাসন, রুপোর গোট এইসবই নাকি রাজবাড়ি থেকে আমিই সরিয়েছি! বলুন তো, গরিবের ওপর এ কী অত্যাচার!...”

নয়ন সামন্ত বুড়োমানুষ। এসে হাতজোড় করে বলল, “মহারাজ, বছরটাক আগে গোবিন্দপুরের গোহাটা থেকে দুধেল গাইটা কিনে এনেছিলুম। সবাই জানে। কোন সুবাদে সেটা রাজবাড়ির গোরু হল সেটা তো বুঝতে পারছি না। রাজকুমারের স্যাঙাতরা গিয়ে বলল, ‘এই তো রাজবাড়ির সেই কামধেনু গোরু। ওরে ব্যাটা, গোরু চুরি করেছিস সেজন্য

কিছু বলছি না, কিন্তু রোজ সকালে দু সের করে দুধ দিয়ে আসবি। এর একটা বিহিত না করলে যে গঙ্গাধরপুরের বাস ওঠাতে হবে।' ”

গণেশ হালদার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, “খালধারের জমিটা আপনার পিতাঠাকুরের কাছে আমার বাবা ন্যায্য দামে কিনে নিয়েছিলেন মহারাজ, মনে নেই? আমার দলিলও আছে। কিন্তু রাজকুমার সে দলিল স্বীকারই করতে চাইছেন না মোটে। খরচাপাতি করে ধান বুনলুম, তা শুনছি নাকি ফসল সব রাজবাড়িতে তুলে না দিয়ে গেলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। আপনার রাজত্বে কি শেষে সপরিবার বেগুনপোড়া হয়ে মরব মহারাজ?

সতীশ বিশ্বাস রোগাভোগা ভিতু মানুষ। ভারী কাহিল মুখ করে এসে বলল, ‘“রাজকুমার বহুকাল পরে ফিরে এয়েছেন, তাতে তো আমাদের আনন্দেরই কথা মহারাজ, তা আনন্দ আমাদের হচ্ছেও। খুবই হচ্ছে। কিন্তু উনি বলেছেন, মাসে মাসে দুশো টাকা করে খাজনা না দিলে ওঁর লেঠেলরা আমার বাড়িতে চড়াও হবে। মহারাজ, এত খাজনা তো সরকার বাহাদুরকেও দিতে হয় না। শেষে কি শুকিয়ে মরব?”

কিন্তু শিকদার বলল, “রাজকুমারের ভয়ে আমরা নালিশ জানাতে আসতেও ভয় পাই। তা আজ তিনি সকালবেলায় দলবল নিয়ে কোথায় যেন গেছেন বলে সাহস করে এসেছি। আপনি প্রজাপালক রাজা, আপনি না বাঁচালে আমাদের যে ধন প্রাণ দুটোই যাবে।”

কথাটা ঠিক নয়। রাজা মহেন্দ্রর রাজত্ব বলে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। প্রজারাও আর তাঁর প্রজা নয়। তবু এদের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব তো আছে!

ঘটনাটা হল, দশ-বারো বছর আগে তাঁর ছেলে নবেন্দ্র কালীমাস্টারের কানমলা খেয়ে রাগে অভিমানে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। রানিমা কেঁদেকেটে শয্যা নিয়েছিলেন! ছেলেকে খুঁজতে জলের মতো টাকাও খরচ করেছিলেন মহেন্দ্র। কোনও লাভ হয়নি।

মাসখানেক আগে এরকমই এক সকালবেলায় রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ পায়ে সুড়সুড়ি লাগায় আঁতকে উঠে দেখেন সামনে লম্বাচওড়া একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে আরও দশ-বারোজন।

ডাকাত পড়েছে ভেবে তিনি হাউমাউ করে উঠলেন, “ওরে বাপু, তোরা বড্ড ভুল জায়গায় এসে পড়েছিস। এ বাড়িতে ডাকাতি করার মতো কিছু আর নেই রে! সেই একান্ন বছর আগে শেষবার ডাকাতি হয়েছিল। এখন ছিচকে চোরও আসে না। তোরা বরং ওই ভল্লনাথ, গোবিন্দ সাউ ওদের বাড়িতে যা।”

লোকটা একগাল হেসে বলল, “বাবা, আমাকে চিনতে পারলে না? আমি যে তোমার নবেন্দ্র!”

নবেন্দ্র! মহেন্দ্র হাঁ হয়ে গেলেন! দশ বারো বছর আগে নবেন্দ্রর দশ-বারো বছর বয়স ছিল। এখন সে এত লম্বাচওড়া হয়েছে যে, চেনার উপায় নেই। তা ছাড়া মহেন্দ্র চোখেও কম দেখেন।

খবর পেয়ে রানিমা ধেয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না, “কোথায় ছিলি বাপ, এতকাল মাকে ছেড়ে! এতদিনে বুড়ো মা বাবার কথা মনে পড়ল? ওরে তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে...”

কিন্তু শাঁখ বাজানো বা উলু দেওয়ার মতো লোকই তো নেই রাজবাড়িতে! বুড়ি দাসী সুবালাই মস্ত শাঁখখানা নিয়ে বিস্তর ফুঁ দিল বটে, কিন্তু দম নেই বলে আওয়াজ বেরোল না।

রানিমা বাজারে তোক পাঠিয়ে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করলেন। তারপর সোনার থালা, রুপোর বাটি বের করারও হুকুম হল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সেসব কিছুই আর রাজবাড়িতে নেই। বহুকাল আগেই বিক্রিটিক্রি হয়ে গেছে।

আয়োজনের খামতি হলেও আনন্দের তেমন খামতি হল না। পাড়াসুদ্ধ লোক ঝেটিয়ে এসে রাজকুমারকে দেখে গেল। বুড়ো পুরুত থুতনি নেড়ে রাজকুমার নবেন্দ্রকে আদর করে বললেন, "সেই মুখ! সেই চোখ! কতটুকু দেখেছি!"

নবেন্দ্র যে অভাবী মানুষ নয়, তা তাকে দেখেই বোঝা যায়। আঙুলে দামি আংটি, হাতে দামি ঘড়ি, গলায় সোনার চেন, পকেটে টাকা, জামাকাপড় রীতিমতো ভাল। মুখে মিষ্টি হাসি আর বিনয়ী ব্যবহার।

ছেলে কেষ্টবিষ্ট হয়ে ফিরেছে মনে করে রাজা মহেন্দ্র আশায় বুক বাঁধলেন। আজকাল ভাতের পাতে ডাল, ভাত আর ঘ্যাঁট ছাড়া বিশেষ কিছু জোটে না, দুধটুকু পর্যন্ত হিসেব করে খেতে হয়। বাজারে মেলা ধার বাকি। মহারানি ছেঁড়া শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেতন না পেয়ে নায়েব, গোমস্তা, চাকরবাকর সব বিদেয় নিয়েছে। রাজবাড়ির বড়ই দুর্দশা। ছেলে যদি এবার সুখের মুখ দেখায়!

তা পরের দিন সকালেই সুখের মুখ দেখে ফেললেন মহেন্দ্র। সিংহাসনে বসে সবে তন্দ্রাটি এসেছে, তাঁর ছেলের দুই ষণ্ডামার্কা স্যাঙাত এসে তাঁর দুই পা দাবাতে বসে গেল। মহেন্দ্র আঁতকে "বাবা রে" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বিগলিত হাসি হেসে তারা বলল, "লাগল নাকি রাজামশাই?"

মহেন্দ্র আতঙ্কিত হয়ে বললেন, "বুড়ো বয়সের হাড়, ভেঙে যাবে যে!"

"তা বলে কি পদসেবা করব না রাজামশাই! আমাদের ওপর হুকুম আছে যে!"

"অ। তা হুকুম থাকলে কী আর করা! কিন্তু বাপু, অভ্যেস নেই যে, ওসব পদসেবাটেবা কি আমার সইবে?"

"উপায় নেই রাজামশাই, পদসেবা না করলে আমাদের গর্দান যাবে। কুমার বাহাদুর আপনার মতোই তেজি পুরুষ, বেয়াদবি একদম পছন্দ করেন না।"

“ওরে বাবা! তা হলে বরং হাতে একটু তেল মেখে নাও বাবারা, তোমাদের হাত যে শিরীষ কাগজের মতো খরখর করছে!”

“আজ্ঞে, সে চেষ্টা কি আর করিনি! রানিমার কাছে তেল চাইতে গিয়েছিলাম। তা তিনি তেল শুনে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।”

মহেন্দ্র হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন। দুই ষণ্ডা তাঁর পদসেবা করেই ছাড়ল না, পা ছেড়ে হাতে উঠল, হাত ছেড়ে কাঁধে, তারপর মাথাতেও বিস্তর তবলাটবলা বাজিয়ে যখন ক্ষান্ত হল তখন মহেন্দ্র নেতিয়ে পড়েছেন। দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি।

তৃতীয় দিন সিংহাসনে গিয়ে বসতে না বসতেই আঁতকে উঠে দেখলেন, দুই ষণ্ডা আবার এসে হাজির। প্রাণের মায়া ছেড়েই দিয়েছেন মহেন্দ্র। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ষণ্ডারা পা দাবাতে দাবাতে বলল, “তা রাজামশাই, রাজবাড়ির পেছনের পুকুরটা কি আপনার নয়? সকালে জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, তা তিন-চারটে লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এল। শুনলুম তারা নাকি পুকুর ইজারা নিয়েছে। সত্যি নাকি?”

“হ্যাঁ বাবারা, হলধর দাসের কাছে ইজারা দেওয়া আছে বটে।”

“তাই বলুন। তা আমরা অনেক কাকুতিমিনতি করলুম যে, একখানা পাঁচ-সাতসেরি রুইমাছ হলেই আমাদের চলবে। রাজবাড়িতে নজরানা দেওয়ারও তো একটা নিয়ম আছে, নাকি বলুন। তা কিছুতেই রাজি হয় না। তাই তখন মোলায়েম করে দু-চারটে রদ্দা মারতেই হল।”

“মারধর করেছ! সর্বনাশ! থানাপুলিশ হবে যে!”

“না, সে ভয় নেই। তারা লক্ষ্মী ছেলের মতো যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে-বসে আছে। কেউ থানামুখো হয়নি।”

শঙ্কিত হয়ে মহেন্দ্র বললেন, “মাছও ধরলে নাকি?”

“ওই একখানা দশসেরি রুই মোটে ধরা হয়েছে।”

পরের দিন ফের পা দাবাতে বসে ষণ্ডারা বলল, “আচ্ছা রাজামশাই, রাজবাড়িতে চোরা কুঠুরিটুরি নেই?”

“না হে বাপু। ছিল কিছু। সব ধসে গেছে।”

“দেওয়ালেটেওয়ালে কোথাও লুকোনো সিন্দুকটিক?”

“না বাবারা। সেসব কিছু নেই।”

“আর সোনা-রুপোর বাসনটাসনগুলো?”

মহেন্দ্র হাত উলটে বললেন, “সেসব কবে বিক্রিবাটা হয়ে গেছে। তা বাবারা, এসব জানতে চাইছ কেন?”

“আজ্ঞে, সাবধান হওয়ার জন্যই জেনে নিচ্ছি। চারদিকে যা চোরছ্যাঁচড়ের উৎপাত! জিনিসপত্রের একটা হিসেব থাকা ভাল।”

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গতিক তাঁর সুবিধের ঠেকছে না।

একদিন রাজা মহেন্দ্র দুপুরবেলা ছাদে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন। এমন সময়ে ভারী জড়োসড়ো হয়ে একটা লোক তাঁর সামনে এসে পেন্নাম করে দাঁড়াল।

মহেন্দ্র আঁতকে উঠে বললেন, “না, না বাবা! এখন আমার পা দাবানোর দরকার নেই। সকালেই হয়ে গেছে।”

“আমি পা দাবাতে আসিনি মহারাজ।”

মহেন্দ্র সন্দিহান হয়ে বললেন, "তবে কি গুপ্তধন?"

"আজ্ঞে না। আমি রাজকুমারের দলের লোক নই।" নিশ্চিন্তির খাস ছেড়ে মহেন্দ্র বললেন, "বাঁচালে বাবা। তা তুমি কে?"

"অধমের নাম শ্রীদাম খড়খড়ি।"

"কী চাও বাপু?"

"আজ্ঞে, একটু কথা ছিল। অনেকদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছি। তা কুমার বাহাদুরের লেঠেলদের দাপটে রাজবাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারিনি। তা দেখলুম দুপুরের দিকে তেনারা খেয়েদেয়ে একটু ঘুমোন। ঘুমেরও দোষ নেই। আজই পদ্মলোচনবাবুর পুরুষ্টু পাঁঠাটা নিয়ে এসে কেটে খেয়েছেন তো! গুরুভোজনের পর ঘুম তো আসবেই।"

"পদ্মলোচনের পাঁঠা! বল কী হে? সে যে ভয়ংকর রাগী আর মারমুখো লোক!"

"তাই ছিলেন। তবে এখন তাঁর পাকানো গোঁফ ঝুলে পড়েছে। রক্ত জল করা চাউনি ঘোলাটে মেরে গেছে, উঁচু গলায় কথাটি কন না। আর তা হবে না-ই বা কেন বলুন! কুমার বাহাদুরের লোকেরা যে তাঁকে তাঁর ছেলেপুলে, নাতিপুতির সামনেই পঞ্চাশবার কান ধরে ওঠবোস করিয়েছে!"

"বল কী?"

"আজ্ঞে, এইসব বৃত্তান্ত শোনাতেই আসা।"

সভয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মহেন্দ্র বললেন, "বৃত্তান্ত আরও আছে নাকি?"

"বিস্তর মহারাজ। বিস্তর। বলতে গেলে মহাভারত।"

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "না, গতিক সুবিধের নয়।"

"মহারাজ, যদি আস্পদ্দা বলে না ধরেন তা হলে শ্রীচরণে দুটো কথা নিবেদন করি।"

"বলে ফেলো বাপু।"

"রাজকুমার নরেন্দ্রর বাঁ বগলের নীচে একটা লাল জড়ুল ছিল।" মহেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "ছিল নাকি?"

"আজ্ঞে। এই অধমের আর কিছু না থাক, ভগবানদত্ত দু' খানা চোখ আছে। রাজকুমার যখন ছোটটি ছিলেন তখন কোলেপিঠেও করেছি কিনা।"

"অ। তা জড়ুলের কথাটা উঠছে কেন?" মাথা চুলকে ভারী লাজুক মুখে শ্রীদাম বলল, "আজ্ঞে, জড়ুলটা এখন আর নেই।"

মহেন্দ্র সটান হয়ে বসে বললেন, "নেই! তা হলে সেটা গেল কোথায়?"

"আজ্ঞে, জড়ুল যথাস্থানে আছে।"

"এ তো বড় গোলমেলে কথা বাপু। একবার বললে জড়ুল ছিল, একবার বললে নেই, ফের বললে জড়ুল যথাস্থানে আছে! তা হলে মানেটা কী দাঁড়াল?"

"ব্যাপারটা যেমন গোলমেলে, তেমনই আবার জলের মতো সোজা। জড়ুলটা যথাস্থানে আছে মানে হল, সেটা অস্থানে নেই।"

"তা বাপু, জড়ুলটা ওরকম লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে কেন? এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলেই তো হয়!"

"জড়ুলকে দোষ দেবেন না মহারাজ। জড়ুলরা লাফালাফি করতে মোটেই পছন্দ করে না। যে জায়গায় থাকার, জতুল সেখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।"

"তা হলে যে বললে 'নেই' ?"

“শুধু ‘নেই’ বলিনি মহারাজ, সেইসঙ্গে ‘আছে’ও বলেছি।”

“ব্যাপারটা তো তা হলে আরও জটিল হয়ে উঠল হে!”

“যে আজ্ঞে জজুল ব্যাপারটা খুবই জটিল। তবু যদি মহারাজ অভয় দেন তো বলি, রাজকুমার যখন ছোটটি ছিলেন তখন তাঁর বাঁ বগলের নীচে লাল একটা জড়ুল ছিল। যখন দিব্যি লম্বাচওড়া হয়ে আপনার কোলে ফিরে এয়েছেন তখন তাঁর বাঁ বগলের নীচে জড়ুলটার চিহ্নমাত্র নেই। এটা কী করে হয় একটু ভেবে দেখেছেন?”

রাজা মহেন্দ্র খুবই ভাবিত হয়ে বললেন, “তাই তো হে! এ তো বেশ সমস্যাঁতেই পড়া গেল দেখছি! তুমি কি বলতে চাও জড়ুলটা বাঁ বগলের নীচে থেকে ডান বগলের নীচে সরে গেছে?”

“না মহারাজ, সেটা বাঁ বগলের নীচেই আছে।” রাজা মহেন্দ্র হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “না হে বাপু, জড়ুলটার মতিগতি আমি ভাল বুঝছি না।”

“একটু তলিয়ে ভাবুন মহারাজ, তা হলেই বুঝবেন।”

“ওরে বাপু, অত ভাবাভাবির কী আছে! বুঝিয়ে বললেই তো হয়।”

“আজ্ঞে, ফাঁদালো করে বলতে ভরসা হয় না মহারাজ। ঘাড়ে তো একখানা বই মাথা নেই। তাই টাপেটোপে বলছি।”

“কেন বাপু, ভেঙে বলতে দোষ কী?”

“গর্দান যেতে পারে। আপনিও কুপিত হতে পারেন।”

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, “ওরে বাপু, আমি গর্দান টর্দান নিতে মোটেই পছন্দ করি না। বুড়ো বয়সে ঘটিবাটি তুলতেই মাজায় ব্যথা হয় তায় খাঁড়া। নির্ভয়ে বলো বাপু শ্রীদাম। জড়ুলটা বাঁ বগলে ছিল, এখন সেটা সেখানে নেই– এই তো?”

“যে আজ্ঞে।”

“আবার দেখা যাচ্ছে, যেখানকার জড়ুল সেখানেই আছে এই

তো?”

একগাল হেসে শ্রীদাম বলল, “এইবার বুঝেছেন। চেপে একটু ভাবলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবার।”

“তা বাপু, তুমি জড়ুলটা সম্পর্কে এত জানলে কী করে? বলি তোমার কি জড়ুলেরই কারবার নাকি?”

“আজ্ঞে না মহারাজ, আমার অন্যদিকে একটু হাতযশ আছে।”

“তা বাপু, জড়ুলের কারবারও কিছু খারাপ ছিল না। ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলতে পারতে। তা তোমার হাতযশটা তা হলে কোন দিকে।”

মাথা নিচু করে শ্রীদাম ঘাড়টাড় চুলকে লজ্জার হাসি হেসে বলল, “আপনি দেশের রাজা, একরকম বাপের মতোই, কী বলেন!”

“অবশ্য, অবশ্য।”

“আগে দেশে কোটাল ছিল, কনিষ্ঠবল ছিল। আজকাল সে জায়গায় দারোগা এয়েছে, কনেস্টবল এয়েছে, ঠিক কিনা?”

“খুব ঠিক।”

“তা তারা কীজন্য এয়েছে বলুন?”

“তারা চোর-ডাকাত ধরতেই এসেছে।”

“তবেই দেখুন, চোর-ডাকাত ছাড়া দারোগা-পুলিশের চলে না, ঠিক তো!”

“খুব ঠিক।”

“আজ্ঞে, আমার তো মনে হয়, চোর-ডাকাত না থাকলে দেশটা যেন কানা হয়ে যায়। ভগবানের রাজ্যে সবাইকেই তো দরকার নাকি? বেড়ালকেও দরকার, ইঁদুরকেও দরকার, বাঘকেও দরকার, ছাগলকেও দরকার, সাদাকেও দরকার, কালোকেও দরকার, একটা

হলে যে অন্যটা ফুটে ওঠে না।”

“সে তো ঠিক কথাই হে শ্রীদাম।”

“তাই বলছিলাম, আমার মতো মনিষ্যির কিছু দরকার আছে বলেই এই অধমের সৃষ্টি হয়েছিল।”

“তা তুমি পুলিশ না চোর?”

“চোর বললে কি আপনি রাগ করবেন?”

“না হে বাপু, না, রাগ করব কেন? পরিশ্রম করে উপায় করা কি খারাপ? তা বলে বাপু, এ বাড়িতে কিন্তু সুবিধে হবে না তোমার।”

হাত কচলে শ্রীদাম বলে, “তা আর বলতে! এ বাড়িতে চোরের একাদশী, একসময়ে কত ঘটিটা বাটিটা সরিয়েছি। সেসব কথা ভাবতেও চোখে জল আসতে চায়। আহা, কী দিনকালই ছিল, রাজপুত্তুররা মোহর দিয়ে ঢিল মেরে মেরে আম পাড়ত। রাজবাড়ির কুকুরের গলায় বকলসের বদলে থাকত নেকলেস। পোলাও কালিয়া ছাড়া কাঙালি ভোজন হত না।”

"উঁহু উঁহু, অতটা বলার দরকার নেই। আর একটু চেপেচুপে বললেই হবে। তা হলে জড়ুলের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বলছ?"

"যে আজ্ঞে। একটু তলিয়ে ভাবুন। কাল আমি আবার এসে হাজির হব'খন। রাজকুমারের স্যাঙাত বাবাসকলের ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

রাজামশাই খুবই চিন্তিতভাবে জড়ুলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। রাতে খেতে বসে রানিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ইয়ে, তা নবেন্দ্রর বাঁ বগলের নীচে নাকি একটা লাল জজুল ছিল? আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি কথাটা। তা ছিল নাকি?"

রানি বললেন, "ও মা! বিশ্বাস না করার কী? আমার নবেনের বাঁ বগলের নীচে লাল জঙুল তো ছিলই। কেমন বাপ গো তুমি যে, ছেলের জড়ুলের কথা মনে রাখতে পার না?"

"তা বটে! মনে রাখাটা উচিতই ছিল। তা সেই জড়ুল নিয়েই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। জড়ুলটা কি যথাস্থানে নেই। না মানে

যথাস্থানেই আছে, তবে আবার নাকি নেইও। আবার নাকি আছেও। ভারী গোলমেলে ব্যাপার। শ্রীদাম বলছিল বটে।"

"শ্রীদামটা আবার কে?"

"তার কথা আর বোলা না, সে একটা চোর। তবে লোকটা ভালই।"

"চোরও বলছ, আবার ভাল লোকও মনে হচ্ছে তাকে?"

"আহা, চোরদের মধ্যে কি ভাল লোক নেই! খুঁজলে বিস্তর পাওয়া যাবে।"

রানিমা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "তবে কথাটা খুব মিথ্যে নয়। নবেনের বাঁ বগলের নীচে জঙুল নেই।"

"নেই! যাক, বাঁচা গেল। আমিও ভাবনায় পড়েছিলাম। তা জড়ুলটা গেল কোথায় বলো তো! ডান বগলের নীচে নাকি?"

"জজুল কি জায়গা বদল করে?"

"তা হলে?"

রানিমা একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "মনে হয় ঘামাচিটামাচি চুলকোতে গিয়ে জড়ুলটা উঠে গেছে।"

"তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।"

রানিমা হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বললেন, "তুমি কি ভাবছ জড়ুল নেই বলে এ আমার নবেন নয়?"

"তাই বললুম নাকি? রামোঃ, একথা আমার মাথাতেই আসেনি, নবেন নয় মানে? আলবত নবেন। ওর ঘাড়ে ক'টা মাথা যে নবেন না হবে?"

"তাই বলো! আমি কিন্তু দেখেই চিনেছি। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দুষ্টু দুষ্টু ভাব। আহা, এখনও সেই এটা খাব-ওটা খাব বলে বায়না।"

বলে রানি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

মহেন্দ্র বললেন, "জড়ুলটা তা হলে ওই ঘামাচির সঙ্গেই উঠে গেছে বলছ!"

"কেন, ওরকম কি হতে নেই?"

"তা হবে না কেন? হতেই পারে। জঙুল তো দেখছি নিতান্তই ফঙ্গবেনে জিনিস।"

"জল নিয়ে আর মাথা গরম কোরো না তো! এতবড় ছেলেটাকে আস্ত ফেরত পেলে, তাতে গাল উঠছে না নাকি? জড়ুলটা ফেরত আসেনি তো কী হয়েছে? ছেলে বেশি, না জড়ুল বেশি?

"আহা, ছেলের সঙ্গে জড়ুলের কি তুলনা হয়? ওসব নয় রানি, ভাবছি চোরটা এলে তাকে কী বলব! জড়ুলটা আছে, না নেই?"

"চোরছ্যাঁচড়ার সঙ্গে অত মেলামেশার তোমার দরকার কী?"

"চোর হলেও সে আমার প্রজা, সন্তানবৎ। বুঝলে না! থাকগে, জতুল নিয়ে তা হলে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।"

"একদম না। নবেন ফিরে এসেছে, সেই আমার ঢের। জড়ুল চুলোয় যাক।"

পরদিন দুপুরবেলা একগাল হাসি নিয়ে শ্রীদাম এসে প্রণাম করে সামনে দাঁড়াল।

রাজা মহেন্দ্র তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "ওহে, বোসো, বোসো।"

"তলিয়ে ভাবলেন নাকি মহারাজ?"

"তা আর ভাবিনি! যা একখানা সমস্যা ঢুকিয়ে দিয়ে গেলে মাথায় যে, আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তোমাদের রানিমার সঙ্গে কথা হল। তা বুঝলে বাপু, জড়ুলটা নাকি ঘামাচি চুলকোতে গিয়ে উঠে গেছে।"

"যে আজ্ঞে।"

"সেরকম কি হয় না?"

"আজ্ঞে, রাজা-রাজড়াদের ঘরে কী না হয় বলুন! সবই হতে পারে। তবে রাজামশাই, আপনি আরও একটু তলিয়ে ভাবলে জড়ুলের একেবারে গোড়ায় যেতে পারবেন।"

“জড়ুলের গোড়ায়? সেখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?”

“আজ্ঞে, না গেলেই যে নয়!”

“কেন বলো তো?”

“ওখানেই সব রহস্য ঘাপটি মেরে আছে।”

“হুঁ, তা তোমার রানিমা অবশ্য বলেছিলেন ছেলে বেশি না জড়ুল বেশি। উনি দেখলুম জড়ুলের বিশেষ ভক্ত নন।”

“আজ্ঞে। তবে কিনা জড়ুল বাদ দিলে রাজকুমারের যে আর কিছুই থাকে না।”

“আচ্ছা, শ্রীদাম, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে এ-ছেলেটা আমাদের নবেন নয়?”

শ্রীদাম জিভ কেটে বলল, “আরে ছিঃ ছিঃ! উনি যখন বলছেন উনিই নবেন, তখন নবেন ছাড়া আর কে হবেন?”

“আমারও সেই কথা। নবেন যখন বলছে সে নবেন, তখন আমাদের আপত্তি করার কী আছে? কী বল?”

ঘন ঘন দু’ধারে মাথা নেড়ে শ্রীদাম বলে, “আমারও আপত্তি হচ্ছে না মহারাজ। নবেন হতে বাধা কী? যে কেউ নবেন হতে পারে!”

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, “পারেই তো। জড়ুলটা ফেরত আসেনি তো কী হয়েছে?নবেন তো ফিরেছে! আর শুধু জড়ুলই বা কেন, নবেনের ডান হাঁটুতে একটা ফোড়া কাটার দাগ ছিল, সেটা ফেরত আসেনি। ডান হাতের কনুইয়ের কাছে একটা আঁচিল ছিল, সেটাও ফেরত আসেনি। একবার চিল ছোঁ মেরে হাত থেকে রসগোল্লা নিয়ে যাওয়ার সময় নবেনের কপালে আঁচড় দিয়ে গিয়েছিল, সেই দাগটাও ফেরত আসেনি। তা ওসব তুচ্ছ জিনিসের জন্য কি আমাদের দুঃখ করা উচিত! নবেন যে ফিরেছে এই ঢের।”

শ্রীদাম চোখ বড় বড় করে বলল, "তবে যে শুনেছিলুম মহারাজ, আপনি চোখে কম দেখেন!"

"দেখিই তো! চোখে কম দেখি, কানে কম শুনি। এই যে তুমি সামনে দাঁড়িয়ে আছ, এই তোমাকেই ঠিকমতো ঠাহর হচ্ছে না। একবার মনে হচ্ছে আছো, একবার মনে হচ্ছে নেই।"

গদগদ স্বরে শ্রীদাম বলে, "এরকম কম দেখলেই হবে মহারাজ। এখন থেকে এরকম কমই দেখতে থাকুন।"

মহেন্দ্র একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "তা বাপু শ্রীদাম।"

"যে আজ্ঞে।"

"তুমি যেন বলেছিলে জড়ুলটা যথাস্থানেই আছে। ঠিক শুনেছিলুম তো?"

"আজ্ঞে ঠিকই শুনেছেন।"

"তা হলে কি ধরে নেব যে, তুমি জড়ুলটার সন্ধান জান?"

"আমার যা কাজ তাতে সুলুকসন্ধান না রাখলে কি চলে মহারাজ?"

"তা তো বটেই, তা বলছিলুম কি, সুলুকসন্ধান দিতে কত মজুরি চাও?"

নিজের দুটো কান ধরে শ্রীদাম বলে, "ছিঃ ছিঃ মহারাজ, মজুরির কথা ওঠে কীসে? রাজবাড়ির নুন কি কম খেয়েছি?"

"ভাল, ভাল, মজুরি চাইলেও দিতে পারতুম না কিনা, তা হলে সুলুকসন্ধানটা কি বিনি মাগনাতেই দেবে?"

শ্রীদাম বুকটা চিতিয়ে বলে, “মহারাজ, রাজার জন্য প্রজা না পারে কী? প্রয়োজন হলে প্রাণটা পর্যন্ত পিরিচে করে এনে পায়ে নিবেদন করতে পারে।”

“বাঃ বাঃ, শুনে বড় খুশি হলুম।”

শ্রীদাম এবার একটু মাথা চুলকে বলে, “তবে মহারাজ, একটা কথা আছে।”

“কী কথা হে বাপু?”

“জানাজানি হলে জডুলের কিন্তু প্রাণসংশয় হবে। যার জডুল নেই সে জডুলওলাকে খুঁজে বেড়াবেই। পেলেই ধড় মুন্ডু আলাদা করবে। মুন্ডু না থাকলে জডুলের আর দাম কী বলুন। ”

মহেন্দ্র চমকে উঠে বললেন, “থাক, থাক, আর বলতে হবে না। জডুল যথাস্থানে থাকলেই হল।”

বিগলিত হেসে হাতটাত কচলে শ্রীদাম বলল, “আজ্ঞে, যথাস্থানের জডুলের হুকুমেই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আসা আমার।”

রাজা মহেন্দ্র হঠাৎ বার্ধক্য ঝেড়ে পটাং করে সোজা হয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বললেন, “বল কী!”

“আজ্ঞে, আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে যথাস্থানে জড়ল আছেই, সেইসঙ্গে ডান হাঁটুতে ফোড়া কাটার দাগ, ডান কনুইতে আঁচিল, চিলের আঁচড় সব পাবেন।”

“আমার যে বুক ধড়ফড় করছে শ্রীদাম!”

“তা করে একটু করুক মহারাজ, ধড়ফড়ানিটা কমলে বলবেন। বাকিটা বলব। আমি বসছি।”

“না, না, বলো।”

“যে আজ্ঞে, আমার ওপর হুকুম হয়েছে আপনাকে তিনটে কথা বলে যেতে।”

“বলে ফেলো শ্রীদাম, বলে ফেলল।”

“কথাগুলো হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান, বারো ধাপ, ভূত ঘর, কিছু বুঝতে পারলেন মহারাজ?”

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, “না হে বাপু। আরবি, ফারসি নয়

তো?”

“আজ্ঞে, নিতান্ত বাংলা কথাই তো মনে হচ্ছে।”

“এর মানে কী?”

“তা তো জানি না মহারাজ। কথাগুলো আপনি মনে মনে একটু নাড়াচাড়া করুন। মনে হয় কিছু একটা বেরিয়ে পড়বে।”

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ ছাদের দরজায় বিভীষণের মতো চেহারার একটা লোকের আবির্ভাব হল। বাজডাকা গলায় লোকটা পিলে চমকানো হুংকার ছাড়ল, “অ্যাই, তুই কে রে? এখানে কী মতলবে?”

দেখা গেল শ্রীদাম রোগাভোগা মানুষ হলেও খুব ঠান্ডা মাথার লোক। একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে তাড়াতাড়ি জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে একগাল হেসে বলল, “সনাতনদাদা যে! প্রাতঃ পেন্নাম! প্রাতঃ পেন্নাম!”

লোকটা যমদূতের মতো সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাঁটার মতো চোখে শ্রীদামকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, “তোকে কে বলেছে যে আমার নাম সনাতন?”

ভারী অবাক হয়ে শ্রীদাম বলল, "সনাতন নয়! এঃ হেঃ!? তা হলে তো বড় ভুল হয়ে গেছে মশাই! আমি যেন কেমন সনাতন সনাতন গন্ধ পেলাম!"

"এ বাড়িতে কেন ঢুকেছিস?"

শ্রীদাম ভালমানুষটির মতো বলে, "ঢাকাটা কি ভুল হয়েছে মশাই? তা হলে না হয় বেরিয়ে যাচ্ছি।"

"বেরোনো অত সোজা নয়!" বলেই ভয়ংকর লোকটা হাত বাড়িয়ে শ্রীদামের ঘাড়টা ক্যাঁক করে ধরে ফেলল। রাজা মহেন্দ্র অবাক হয়ে দেখলেন, বিভীষণটা শ্রীদামের ঘাড়টা ধরল বটে, আবার যেন ধরলও না! শ্রীদাম ভারী বিনয়ের সঙ্গে ঘাড়সুষ্ঠু মাথাটা কেমন করে যেন লহমায় সরিয়ে নিল।

সনাতন খুব অবাক হয়ে শ্রীদামের দিকে চেয়ে "তবে রে" বলে থাবড়া তুলে এগিয়ে যেতেই শ্রীদাম বলে উঠল, "মারবেন না মশাই, মারবেন না। আমার বড্ড নরম শরীর। মারলে বড় লাগে।"

সনাতন নামক দৈত্যটা বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে শ্রীদামের ওপর এমনভাবে পড়ল যে, শ্রীদামের পিষে যাওয়ার কথা। রাজা মহেন্দ্র ভয়ে চোখ বুজে ফেললেন। চোখ চেয়ে দেখেন, বিভীষণটা গদাম করে ছাদের ওপর পড়ে গেল। তারপর "বাবা রে, মা রে" বলে আছাড়িপিছাড়ি খেতে লাগল। শ্রীদাম ছাদের কার্নিশের ধার থেকে মহেন্দ্রকে একটা পেন্নাম করে বলল, "তা হলে আজ আসি রাজামশাই, মাঝে মাঝে শ্রীচরণ দর্শনে চলে আসব'খন, ভাববেন না," বলেই রেলিং টপকে নেমে গেল।

মহেন্দ্র একটা ভারী আরামের শ্বাস ছাড়লেন। দুদ্দাড় করে বাড়ি কাঁপিয়ে দৈত্য দানোর মতো নবেন্দ্রর স্যাঙাতরা সব ছাদে এসে হাজির। তারপর তুমুল চেঁচামেচি, "কে মারল সনাতনকে! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, কার এত আস্পদ্ধা! আজ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। তার মুন্ডু নিয়ে পান্তুয়া খাব। বুকের পাটা থাকে তত বেরিয়ে আয় ব্যাটা!"

রাজপুত্র নবেন্দ্র গম্ভীর মুখে মহেন্দ্রর সামনে এসে দাঁড়াল, "এসব কী বাবা!"

মহেন্দ্র জুলজুল করে নবেন্দ্রর দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কী একটা চেঁচামেচি হল যেন শুনলাম, কানে ভাল শুনতে পাই না তো! কী ব্যাপার বলো তো বাবা! এত হুলুস্থুলু কীসের?"

"তোমার কাছে কে এসেছিল?"

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "কেউ আসেনি তো! ওঃ হোঃ বোধ হয় একটা গোর ঢুকে পড়েছিল কোনও ফাঁকে।"

"গোরু! ছাদের ওপর গোরু কী করে আসবে?"

মহেন্দ্র ভারী অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে বললেন, "ছাদ! এটা ছাদ নাকি? এই দ্যাখো, বুড়ো বয়সের ভিমরতি আর কাকে বলে, উঠোনে গিয়ে রোদে বসব বলে বেরিয়ে ভুল করে ছাদে এসে পড়েছি বোধ হয়।"

রাজপুত্র নবেন্দ্র তার স্যাঙাতদের দিকে ফিরে বলল, "এখন থেকে তোমরা আরও সতর্ক থাকবে। ফের যদি গাফিলতি দেখি তা হলে কিন্তু চাবকে ঠান্ডা করে দেব।"

সনাতনকে ধরাধরি করে তোলা হল। সে এখনও কাতরাচ্ছে। নবেন্দ্র তার দিকে চেয়ে বলল, "তোমার বাহাদুরি দেখলাম। শরীরটাই বাগিয়েছ, যোগ্যতা বলে কিছু নেই। দূর হয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে।"

মহেন্দ্রর দিকে ফিরে নবেন্দ্র গম্ভীর গলায় বলল, "এখন থেকে বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনও দরকার নেই বাবা। আমি যখন এসে গেছি তখন আমিই সবদিক সামলাব।"

মহেন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, “বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো, আমিও তো তাই চাই।” নবেন্দ্রকে খুবই চিন্তিত দেখাল, কী যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে নীচে নেমে গেল।

৬. ম্যাজিশিয়ান, বারো ধাপ, ভূত ঘর

ম্যাজিশিয়ান, বারো ধাপ, ভূত ঘর নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাজা মহেন্দ্রর মাথাটায় আজ বায়ু চড়ে গেল। যখন তখন ঘুমিয়ে পড়া তাঁর অভ্যাস, অথচ আজ কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছে না, খাট ছেড়ে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। ওই তিনটে শব্দকে মাথা থেকে তাড়ালে ঘুম আসবেও না। ঘাড়ে, মাথায় জলটল থাবড়ে তিনি ফের শুলেন। জড়লটা যথাস্থানে আছে এ-খবরটা পাওয়ার পর থেকে মনটা আরও চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পরিণতি কী, সেটা ভেবে পাচ্ছেন না। এই তিনটে শব্দ কি কোনও সংকেত! কে জানে বাবা। শ্রীদাম লোকটা কীরকম তাও ভেবে কুল পাচ্ছেন না। লোকটাকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি চোখ বুজে বীজমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। তাই করতে করতে একটু তন্দ্রামতো এল।

রাজা মহেন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন, দরবার ঘরে রাজপরিবারের সবাই জড়ো হয়ে একটা ম্যাজিক শো দেখছে, একজন অল্পবয়সি ছোঁকরা ম্যাজিক দেখাচ্ছে। তাসের খেলা, মানুষ অদৃশ্য করার খেলা, রোপ ট্রিক। খেলাগুলো মন্দ নয়। কিন্তু শেষ খেলাটাই মারাত্মক। হঠাৎ ম্যাজিশিয়ান শূন্যে উঠে সারা দরবার ঘরে পাখির মতো উড়ে বেড়াতে লাগল। কখনও ছোঁ মেরে নেমে আসে, ফের সাঁ করে উঠে যায় আর সারা ঘরে পাক খায়...

স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেন, মহেন্দ্র। তাই তো! ঘটনাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন। বহু বছর আগে তাঁদের বাড়িতে সত্যিই একজন ম্যাজিক দেখাতে এসেছিল। তার নামটা মনে আছে মহেন্দ্রর। ভজহরি।

ভজহরির শেষ খেলাটা দেখে সবাই ভারী তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভেঙে একটা মানুষ যে ওরকম উড়ে বেড়াতে পারে তা চোখে দেখেও যেন কারও বিশ্বাস

হচ্ছিল না। সবাই জানে ম্যাজিশিয়ানরা যা দেখায় সবই কৌশলমাত্র। কিন্তু দরবার ঘরের ফাঁকা অভ্যন্তরে কোন কৌশলে ভজহরি উড়ে বেড়াল তা কারও মাথায় এল না। তবে সবাই গিয়ে ভজহরির পিঠটিট চাপড়ে দিল।

কিন্তু ভজহরি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিবর্ণ মুখে বসে ছিল। লোকে বাহবা দিচ্ছিল বটে, কিন্তু ভজহরি তেমন গা করছিল না। মুখে হাসি তো নেই-ই, বরং কাঁদো কাঁদো ভাব।

লোকজন সরে যাওয়ার পর মহেন্দ্র গিয়ে ভজহরিকে ধরলেন, "মশাই, আপনার শেষ খেলাটা কী করে দেখালেন বলুন তো! সাজ্ঘাতিক খেলা মশাই।"

ভজহরি চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তো দেখাইনি!"

"সে কী!"

"হ্যাঁ মশাই, ও খেলা আমি জীবনে কখনও দেখিওনি, দেখাইওনি।

"তা হলে কী করে হল?"

"সেইটেই তো ভাবছি।"

"যাঃ, আপনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।" সবেগে মাথা নেড়ে ভজহরি বলল, "না, ঠাট্টা করার মতো মনের অবস্থা নয়। আচ্ছা মশাই, এই বাঁ দিকটায় যেসব মহারাজ বসে ছিলেন তাঁরা কারা বলুন তো!"

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "বাঁ দিকটায় তো কেউ ছিল না! ওদিকটা তো ফাঁকাই ছিল।"

ভজহরি গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "তা হয় কেমন করে? ওই বাঁ দিকটায় সারি দিয়ে বারোজন মহারাজা বসে ছিলেন। নিজের চোখে দেখা।"

মহেন্দ্র হেসে ফেলে বললেন, "একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে বারোজন। কিন্তু আমরা তো একজনকেও দেখতে পাইনি।"

ভজহরি বিবর্ণ মুখে বলল, "সে কী মশাই! স্বচক্ষে দেখেছি যে! কী ঝলমলে জরির পোশাক, কী পাকানো গোঁফ, কারও কারও গালপাট্টাও ছিল। বাবরি চুল, লম্বাচওড়া টকটকে ফরসা চেহারা। কোমরে তলোয়ারও ছিল কয়েকজনের। গম্ভীর মুখে বসে খেলা দেখছিলেন। খেলার শেষে তাঁরা আমাকে বকশিশও দিয়ে গেছেন।"

"বকশিশ! কী বকশিশ দিয়েছে দেখি।"

ভজহরি তার কোটের পকেট থেকে একমুঠো মোহর বের করে দেখাল, "এই যে দেখুন, মোট বারোটা আছে। তার মানে ওঁরা বারোজনই ছিলেন। শো শেষ হওয়ার পর ওঁরা উঠে এসে আমাকে বকশিশ দিয়ে ওই বাঁ ধারের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "সিঁড়ি! দরবার ঘরে তো কোনও সিঁড়িই নেই!"

ভজহরি বাঁ দিকটায় একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, "এখন নেই, কিন্তু একটু আগেও তো ছিল! ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দরজা

খুলে ভেতরে চলে গেলেন।"

"দরবার ঘরে যে ওরকম দরজাও নেই। নিরেট দেওয়াল দেখছেন না।"

"কিন্তু একটু আগেও যে ছিল! কী হল বলুন তো দরজাটার। খুব কারুকাজ করা একটা কাঠের দরজা।"

লোকটা কী আবোল তাবোল বকছে তার মাথামুন্ডু কিছুই মহেন্দ্র বুঝতে পারলেন না। তবে এটা মনে আছে, সবাই চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ফাঁকা দরবার ঘরে ভজহরি বজ্রাহতের মতো বসে ছিল। পরদিন সকালে আর তাকে দেখা যায়নি।

ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ায় রাজা মহেন্দ্র মাঝরাতে উঠে বিছানায় ভূতগ্রস্তের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

এই ঘটনার সঙ্গে কি ম্যাজিশিয়ান, বারো ধাপ আর ভূত ঘরের কোনও সম্পর্ক আছে? কিন্তু সম্পর্কটা কী হতে পারে তা মহেন্দ্র ভেবে পেলেন না। নাঃ, শ্রীদাম লোকটা যে কী বিদঘুঁটে কতগুলো কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল মাথায়! কোনও মানেই হয় না। স্বপ্নটাই বা কেন দেখলেন কে জানে!

হঠাৎ চিড়িক করে একটা শব্দ হওয়ায় মহেন্দ্র চমকে উঠে চারদিকে চাইলেন। কোথায় শব্দটা হল তা বুঝতে না পেরে কান খাড়া করে রইলেন। ফের চমকে দিয়ে আবার চিড়িক শব্দ! মহেন্দ্র ভারী অবাক হচ্ছেন। এরকম শব্দ তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। তিনবারের পর ফের চিড়িক শব্দ হওয়ায় মহেন্দ্র 'বাপ রে' বলে দু হাতে নিজের মাথাটা ধরলেন। শব্দটা হচ্ছে তাঁর মাথায়। সর্বনাশ! সন্ন্যাস রোগটোগ হল নাকি?

তিন চিড়িকের পর কিছুক্ষণ মাথা অন্ধকার হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ফস করে অন্ধকার মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলে উঠল। ঠিক যেন শেজবাতি। আর সেই আলোতে মহেন্দ্র দিব্যি পদ্মলোচনকে দেখতে পেলেন।

পদ্মলোচন ছিল রাজবাড়ির বহু পুরনো কাজের লোক। একশোর কাছাকাছি বয়স। সারা বাড়ি ভূতের মতো ঘুরে বেড়াত। সাদা চুল, সাদা দাড়ি-গোঁফ। সবসময়ে বিড়বিড় করে আপনমনে কথা কইত। লোকে বলত, খ্যাপা লোচন।

রাজা মহেন্দ্র দেখতে পেলেন, তিনি সেই কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেই যেন ফিরে গেছেন। ঘরে শেজবাতি জ্বলছে। তিনি বিছানায় শোওয়া, আর পদ্মলোচন বাইরে থেকে তাঁর মশারি গুঁজে দিতে দিতে আপনমনে বকবক করে যাচ্ছে। প্রথমটায় কথাগুলো খেয়াল করছিলেন

না মহেন্দ্র। হঠাৎ ম্যাজিকওয়ালা' কথাটা কানে আসায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছ লোচনদা?"

"ওই ম্যাজিকওয়ালার কথাই বলছি বাপু, অমন ভিরমি খাওয়ার কী হল তা বুঝি না। দরবার ঘরে তো তেনাদের নিত্যি আনাগোনা।"

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, "কাদের আনাগোনা?"

"ওই যে তেনারা, যাঁরা আসেন।"

"তাঁরা কারা লোচনদা?"

"তোমাদেরই পূর্বপুরুষরা ছাড়া আর কে হবেন?"

"অ্যাঁ! তুমি তাঁদের দেখতে পাও নাকি?"

"নিত্যি দেখছি। দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নামেন, পায়চারি করেন, চারদিকে ঘুরে সব দেখেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান।"

"দুর! কী যে বল! দরবার ঘরে সিঁড়ি কোথায়?"

"না থাকলে আছে কী করে?"

"তোমার যত গাঁজাখুরি গল্প।"

"গল্প কী গো! তেনাদের সঙ্গে যে আমার কথা হয়।"

মহেন্দ্র হেসে ফেললেন, "কথাও হয়? তা কী বলেন তাঁরা?"

"কী আর বলবেন! আগের দিনকাল আর নেই বলে দুঃখটুঃখ করেন। তাঁরা লোকও বড্ড ভাল। গরিব দুঃখীদের জন্য প্রাণ কাঁদে। বুড়ো রাজা তো প্রায়ই জোর করেই আমার হাতে

মোহর খুঁজে দেন। বলেন, 'ওরে লোচন, কয়েকখানা মোহর নিয়ে কাছে রাখ। দুর্দিনে কাজে লাগবে।' তা আমি হাতজোড় করে বলি, না বাবা না, বয়স পাঁচ কুড়ি পেরোতে চলল, এখন মোহর দিয়ে কাজ কী? 'তবু জোর করেই দেন।' "

মহেন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, "তুমিও মোহর পেয়েছ?"

"জোর করে দিলে কী করব বলো!"

"তা মোহরগুলো তুমি কর কী?"

"কী আর করব। বাক্সে রেখে দিই।"

"বাক্স! তোমার আবার বাক্সপ্যাঁটরা ছিল কবে? কখনও তো দেখিনি!"

"আহা, আমার বাক্স আসবে কোত্থেকে? বুড়ো রাজাই বাক্স দিয়েছেন। ভারী সুন্দর বাহারি বাক্স। সেখানা রোজ রাতে মাথায় দিয়ে শুই।"

খ্যাপা লোচনের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। মহেন্দ্রও করলেন না। পাগলের প্রলাপ মনে করে উড়িয়ে দিলেন।

হঠাৎ এতদিন পরে যেন ঘটনাগুলোর ভেতরে একটা অর্থ ভেসে উঠতে চাইছে, ঠিক যেমন ঘোলের মাথায় মাখন।

মহেন্দ্র একটু উত্তেজিত হয়ে টর্চবাতিটা নিয়ে খাট থেকে নামতে নামতে আপনমনেই বলে উঠলেন, "নাঃ, দরবার ঘরখানা ভাল করে দেখতে হচ্ছে।"

কে যেন খুব মোলায়েম গলায় বলে উঠল, "আজ্ঞে, কাজটা ঠিক হবে না।"

চমকে উঠে মহেন্দ্র বললেন, "কে?"

"আজ্ঞে, আমি শ্রীদাম খড়খড়ি।"

নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে মহেন্দ্র বললেন, "তাই বলো! তা এত রাতে কী মনে করে হে বাপু?"

"আজ্ঞে, আমার তো রাতবিরেতেই কাজ।"

"তাও তো বটে! খেয়াল ছিল না। তা কী বলছিলে যেন?"

"আজ্ঞে, বলছি এখন দরবার ঘরে যাওয়াটা আপনার ঠিক হবে না।"

"কেন বলো তো বাপু?"

"আজ্ঞে, ওনারা সব রয়েছেন কিনা!"

আঁতকে উঠে রাজা মহেন্দ্র বললেন, "কারা?"

"আজ্ঞে, রাজকুমার নবেন্দ্রর চেলাচামুণ্ডারা।"

"অ্যাঁ, তা তারা এত রাতে কী করছে সেখানে?"

"রোজ যা করেন।"

"রোজ কী করে তারা?"

"কী যেন খোঁজেন।"

"কী খোঁজেন বলল তো!"

"গুপ্তধনটনই হবে বোধ হয়। কে আর জিজ্ঞেস করতে গেছে। বলুন। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা!"

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এ তো বড় চিন্তার কথা হল। তোমার কি মনে হয় এ বাড়িতে গুপ্তধন আছে?"

"আজ্ঞে, না মহারাজ। এ-বাড়ি আমার রগে রগে চেনা।"

"যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হঠাৎ করে গুপ্তধনটন বেরিয়ে পড়লে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠবে হয়তো। বুড়ো বয়সে গুপ্তধনের ধকল কি আর আমার সইবে।"

"যে আজ্ঞে মহারাজ। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় গুপ্তধন জিনিসটা বোধ হয় খুবই খারাপ। টাকাপয়সা, সোনাদানা যদি গা ঢাকা দিতে থাকে তা হলে বড়ই অসুবিধে। খোলামেলা আলো হাওয়ায় থাকলে আমাদের মেহনত অনেক বেঁচে যেত। দেখছেন না রাজপুত্তুরের স্যাঙাতদের কেমন গলদঘর্ম হতে হচ্ছে!"

রাজা মহেন্দ্র একটু ভয়-খাওয়া গলায় বললেন, "তা ওরকম তেড়েফুঁড়ে খুঁজলে কিছু আবার বেরিয়ে পড়বে না তো হে শ্রীদাম? অত খোঁজাখুঁজি কি উচিত হচ্ছে?"

"আমিও তাই ভাবছি মহারাজ। যেরকম আদাজল খেয়ে লেগেছেন তাতে গুপ্তধনের কপালে কষ্ট আছে।"

"তাই তো হে। আমি ভাবছি কেঁচো খুঁড়তে আবার না সাপ বেরিয়ে পড়ে! তা ইয়ে, বাপু শ্রীদাম।"

"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

"একটা কথা ভাবছি।"

"কী কথা মহারাজ?"

"ইয়ে, তুমি কি ভূতটুতে বিশ্বাস কর?"

“বিশ্বাস না করলে ভূতেরা যে ভারী দুঃখ পান মহারাজ। দুঃখ পেলে তাঁদের ভারী অভিমান হয়, আর অভিমান হলে তাঁরা আর মুখ দেখান না। সেইজন্যই যারা ভূতে বিশ্বাস করে না তারা কখনও ভূত দেখতে পায় না।”

“তার মানে কী হল বাপু শ্রীদাম? তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ভূত দেখেছ?”

“আপনার আশীর্বাদে তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ দহরম মহরম।”

“বল কী হে?”

“আজ্ঞে, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় না রাখলে কি আমাদের কাজ কারবার চলে রাজামশাই? এই তো পরশুদিনই ফটিক হাজরার বাড়ির পশ্চিমের ঘরের দরজার কবজাটি খসিয়ে ঢুকতে গেছি, অমনি ফটিক হাজরার বুড়ি ঠাকুমার ভূত একেবারে করালবদনী কালীর চেহারায় এসে পথ আটকে দাঁড়াল। সে কী তড়পানি মহারাজ! তা সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম, “ঠাকমা, ই কী চেহারা হয়েছে আপনার! শুকিয়ে যে আমসি হয়ে গেছেন! এঃ হেঃ, যমরাজার ডেরায় তো আপনার মোটেই যত্ন আত্তি হচ্ছে না। তাতে বুড়ি ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “আর বলিস না বাছা, সেখানে বড়ই অব্যবস্থা। এই বলে সাতকাহন দুঃখের কথা ফেঁদে বসল। তারপর নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফটিকের ঘরে কোথায় কী লুকোনো আছে দেখিয়ে দিল। তাই বলছিলুম মহারাজ, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় না রাখলে কি আমাদের চলে?”

“তা ইয়ে, বাপু শ্রীদাম, রাজবাড়িতেও তো তোমার খুব যাতায়াত, না কী বল!”

“যে আজ্ঞে।”

“তা এ-বাড়িতে কখনও কিছু দেখেছটেখেছ?”

“কী যে বলেন মহারাজ! এই তো ঢুকবার মুখেই লোচন দাদুর সঙ্গে দেখা। ভারী বেজার মুখে বিড়বিড় করে কাকে যেন শাপশাপান্ত করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। তা

বললুম, ও লোচনখুড়ো, বলি বাক্সখানার হদিস পেলে? তা আমার দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, "ও বাক্স হজম করে এমন লোক এখনও জন্মায়নি, বুঝলি! ও বাক্স ফেরত আসবেই।"

রাজা মহেন্দ্র সটান হয়ে বসে বললেন, "বাক্স! কীসের বাক্স!"

"আজ্ঞে, লোচনখুড়ো পাগলছাগল মানুষ।কী বলেন তার ঠিক নেই। তবে অনেকদিন ধরেই একটা বাক্স খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তা মহারাজ, বাক্সের কথায় কি আপনি একটু চমকে উঠলেন?"

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বাপু শ্রীদাম।"

"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

"তোমার সঙ্গে আমার একটু গুরুতর কথা আছে।"

"যে আজ্ঞে।"

"কথাটা না বললেই নয়। তাই বলছি।"

৭. দুর্গা মালোর কাণ্ড

দুর্গা মালোর কাণ্ড দেখে হাঁদু মুগ্ধ। রসো পান্তিকে একটা কনুইয়ের গুতো দিয়ে বলল, "দেখলেন! দেখলেন! দুর্গা মালোর কাজটা দেখলেন!"

রসো সবই দেখেছে। কিন্তু খুশি হয়নি। সে শিল্পী মানুষ, কাঁচা হাতের কাজ দেখলে খুশি হয় না। কিন্তু সে-কথা হাঁদুকে বোঝাবে কে? সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দেখলুম!"

হাঁদু গদগদ স্বরে বলল, "আহা, আজ আমার দুটো চোখ সার্থক হল! কী বুকের পাটা, কী হাতের কারসাজি, কী চটপটে কাজ! মশাই, নাড়া বাঁধতে হয় তো ওই দুর্গা মালোর কাছে। এত লোকের চোখের সামনে কেমন লাখ টাকার জিনিস হাপিস করে হাসতে হাসতে চলে গেল! একেই বলে ওস্তাদ।"

রসো বুঝতে পারছে, হাঁদুকে আর রাখা যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শুধু বলল, "গুনে দেখেছি, দুর্গা মালোর এই সামান্য কাজে মোট সাতটা ভুল। বড্ড কাঁচা হাত রে।"

"দুর মশাই, আপনার কেবল কথার ফুলঝুরি। এই আমি আপনার শাগরেদিতে ইস্তফা দিয়ে চললুম দুর্গা মালোর কাছে। লাথি খাই, ঘাড়ধাক্কা খাই, তবু পা জড়িয়ে পড়ে থাকব দুর্গা মালোর আখড়ায়।"

এই বলে হাঁদু হনহন করে দুর্গা মালোর পা জড়িয়ে ধরতে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দুর্গা মালোর পা জড়িয়ে ধরার জন্য যে আরও অনেকে লাইন দিয়েছে সেটা হাঁদুর জানা ছিল না।

খানিকটা ছুটবার পর দুর্গা মালো যখন দেখল, আর কেউ তার পিছু নেয়নি, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দোকানে বসে জিলিপি খেল। মনটা খুশিতে ভরা, একখানা দোতলা বাড়ি, বিঘেদশেক জমি আর দু'বিঘের মতো পুকুর- এ হলেই তার আপাতত হয়ে যাবে। খেতে ফসল, পুকুরে মাছের চাষ। আর চাই কী! তারপর ছোটখাটো কাজ ছেড়ে একটা ডাকাতির দল খুলে ফেলবে। সূক্ষ্ম হাতের কাজ খারাপ নয় বটে, কিন্তু ডাকাতিতেই হল আসল সুখ। জিনিসপত্রগুলো সাবধানে গামছায় বেঁধে কোমরে এঁটে নিল দুর্গা, তারপর বেরিয়ে পড়ল।

একটা জোয়ান লোক হঠাৎ ছলোছলো চোখে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, "ওস্তাদ, শ্রীচরণে একটু ঠাঁই দিতে হবে যে!"

দুর্গা সতর্ক হয়ে এক পা পিছিয়ে বলল, "কে রে তুই?"

"অধমের নাম পীতাম্বর। আজ স্বচক্ষে যা দেখলাম এরপর নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। পায়ে ঠেলবেন না ওস্তাদ, চাই কী

আপনার ঘর ঝটপাট, বাসন মাজা সব করতে রাজি আছি।"

দুর্গা খুশির হাসি হেসে বলল, "আরে হবে, হবে। দু'দিন সবুর কর। একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নিই তারপর দল খুলব। তখন আসিস।"

"না ওস্তাদ, এ সুযোগ আর পাব না। আপনি আমাকে কি আর তখন মনে রাখবেন? সে হবে না, এখনই শ্রীচরণে ঠাঁই দিতে হবে।" বলেই নোকটা দড়াম করে পায়ের ওপর পড়ে দুটো পা চেপে ধরল।

"আহা, করিস কী, করিস কী রে আহাম্মক!"

আর একটা লোক হঠাৎ পাশ থেকে উদয় হয়ে বলল, "আহা হা পীতাম্বর, ও কী হচ্ছে? তুমি দু-দুটো পা দখল করে থাকলে আমরা যাব কোথায়?" বলে এ লোকটাও পা চেপে ধরে ডুকরে উঠল, "মারুন, কাটুন, যা খুশি করুন, চরণ আর ছাড়ছি না গুরু!"

দুর্গা ফাঁপরে পড়ে আঁকুপাঁকু করছে। এমন সময়ে আরও একজন উদয় হল, কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে মিহিন সুরে বলল, "সীতার বনবাস দেখেও এমন কাঁদিনি, আজ আপনার হাতের কাজ দেখে আনন্দে যত কেঁদেছি। স্বপ্ন দেখলাম নাকি বুঝতে পারছি না। ওরে বাপু, পা দু'খানা দখল করে থাকলে আমাদের কি চলে!"

এ লোকটা পা দখল করতে না পেরে হাঁটু জাপটে বসে পড়ল। দুর্গা মালো চেঁচাতে লাগল, "ওরে ছাড়, ছাড়! কথা দিচ্ছি তোদের দলে নেব।"

এমন সময় আরও পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে বলো দুর্গা মালো কি জয়... বলো দুর্গা মালো জিন্দাবাদ... বলো দুর্গা মালো জগতের আলো..' বলতে বলতে এসে একেবারে ঘিরে ফেলল দুর্গাকে। একজন কোমর জড়িয়ে ধরল, আর একজন পেট, আর দু'জন দু'হাত ধরে ঝুলে পড়ল, একজন গলা পেঁচিয়ে ঘাড় এমন টাইট মারল যে, দুর্গার দম বন্ধ হয়ে এল।

"ওরে করিস কী? করিস কী?"

কে শোনে কার কথা! হাতগুলো ক্রমে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরছে। চোখ উলটে দুর্গা গোঁ গোঁ করতে লাগল। তারপর আর তার জ্ঞান রইল না।

একটু দূর থেকে দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখছিল হাঁদু। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর লোকগুলো খুব যত্ন করে দুর্গা মালোকে মাটিতে শুইয়ে দিল। একজন কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিল। আর একজন দুর্গার ট্যাঁক আর পকেটে যা ছিল বের করে নিল। তারপর ধীরেসুস্থে ভিড়ের মধ্যে একে একে মিশে গেল। হাঁদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর গুটি গুটি ফিরে চলল রসো পান্তির কাছে।

.

"আহা মশাই, খোকাটিকে অমন ঢেকেঢুকে নিচ্ছেন, ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে যে!"

নবকান্ত থমকে দাঁড়িয়ে টেকো আর গুফো লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "কীসের খোকা? কার খোকা?"

"আপনার চাঁদরের তলায় ওটি খোকা নয়?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে কী বলুন তো! জুতোর বাক্স নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"তা যা-ই হোক, সাবধানে নেবেন। বড্ড চুরি-ছিনতাই হচ্ছে এই ঝিকরগাছার হাটে। এই তো শুনলুম একটু আগে নবীন পাকড়াশির দোকান থেকে ক্যাশবাক্স উধাও হয়েছে। দেশটা চোরে-ডাকাতে ভরে গেল মশাই।"

"তা হবে।"

"শুধু কি চোর! শুনলেন না একটু আগে মাইকে বলছিল, শীতল দাসের খুনি শ্যামাপদ নাকি জেল থেকে পালিয়ে এই দিকেই এসেছে। ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।"

শীতল দাসের খুনি শ্যামাপদ শুনে নবকান্তর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। একটু আগে না একটা লোক তাকেই শ্যামাপদ বলে ভুল করেছিল! কী সর্বনাশ! সে কি শ্যামাপদর মতো দেখতে নাকি!

ক্ষীণ স্বরে নবকান্ত বলল, "তাই নাকি?"

"তবে আর বলছি কী! ভয়ংকর খুনি মশাই। হাটসুদ্ধু লোক তো পুরস্কারের কথা শুনে কাজ কারবার ফেলে এখন শ্যামাপদকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে!"

"অ্যাঁ।"

"দু'গাড়ি পুলিশও এসে নামল একটু আগে। ওই উত্তর দিক থেকে তারা মার্চ করতে শুরু করেছে। যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই মারতে মারতে দারোগাবাবুর সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলছে।"

নবকান্ত ভারী কাহিল বোধ করতে লাগল। অবশ হাতে ধরা বাক্সটা ভারী ঠেকছে। নবকান্ত লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "মশাই, আমার একটা উপকার করতে পারেন?"

"বিলক্ষণ! উপকার করতে আমি খুব ভালবাসি।"

"আমার বড্ড জ্বর আসছে। এই বাক্সটা একটু গচ্ছিত রাখবেন? আমি গোবিন্দপুরের নবকান্ত রায়। দয়া করে যদি কখনও পৌঁছে দেন।"

লোকটা বলল, "এ আর বেশি কথা কী! আপনি রওনা হয়ে পড়ুন বাক্স ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাবে।"

নবকান্ত আর দাঁড়াল না। তিরবেগে হাট ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল। তারপর দৌড়।

.

শো শেষ হয়েছে, ভজহরির দুই শাগরেদ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। একটু বাদে তাঁবুটা গুটিয়ে নিয়ে রওনা দিলেই হয়। বাইরে গোরুর গাড়িও তৈরিই আছে।

একটা লম্বা-চওড়া লোক এসে ভজহরির সামনে দাঁড়াল। "ভজহরিবাবু, নমস্কার।"

ভজহরি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "আজ্ঞে, নমস্কার।"

“গঙ্গাধরপুরের কুমার বাহাদুর আজ আপনার খেলা দেখে খুব খুশি হয়েছেন।”

গঙ্গাধরপুর নামটা শুনেই ভজহরির বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা একটা লাফ মারল। অস্ফুট গলায় ভজহরি বলল, “গঙ্গাধরপুর!”

“যে আজ্ঞে। বহু বছর আগে আপনি গঙ্গাধরপুরের রাজবাড়িতে খেলা দেখিয়ে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়েছিলেন, মনে আছে?”

ভজহরি চোখটা নামিয়ে নিয়ে মিনমিন করে বলল, “তা হবে হয়তো! কত জায়গাতেই তো খেলা দেখিয়েছি!”

“সে যাই হোক, কুমার বাহাদুরের খুব ইচ্ছে আপনি আর একবার গঙ্গাধরপুরের রাজবাড়িতে খেলা দেখাবেন। এই যে, এই দুশো টাকা আগাম রাখুন। খেলা দেখানোর পর আরও হাজার টাকা।”

ভজহরি হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলল, “না মশাই, এখন বয়স হয়েছে, আর ছোটাছুটি পোয় না। কুমার বাহাদুরকে আমার নমস্কার জানাবেন। আমি এবার রিটায়ার করব। আমাকে ছেড়ে দিন।”

লোকটা মৃদু হেসে বলল, “তাই কি হয়? কুমার বাহাদুর যা ইচ্ছে করেন তা না করে ছাড়েন না। আপনি গুণী মানুষ, এই হাটে বাজারে তাঁবু খাঁটিয়ে খেলা দেখানো কি আপনার কাজ! কুমার বাহাদুরকে খুশি করতে পারলে আপনার বরাত খুলে যাবে। ”

ভজহরি মাথা নেড়ে বলল, “না মশাই, না। আমি পেরে উঠব না। আমাকে মাফ করবেন।”

“কুমার বাহাদুরের অনুরোধটা রাখলে ভাল করতেন।” বলে লোকটা চলে গেল।

লালু আর নদুয়া বলে উঠল, “এঃ ওস্তাদজি, ভাল দাঁওটা ছেড়ে দিলেন!”

ভজহরি জবাব দিল না। তার মনটা বড় খারাপ লাগছে। ঘণ্টাখানেক বাদে দুটো গোরুর গাড়িতে জিনিসপত্র চাপিয়ে তারা রওনা হয়ে পড়ল। সামনের গাড়িতে ভজহরি, পিছনেরটায় লালু আর নদুয়া। ভজহরির গ্রাম কাছেই। এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়ার কথা।

ভজহরি গোরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে শুয়ে চোখ বুজে নানা কথা ভাবছিল। মোহরের লোভ যে কী সাঙ্ঘাতিক তা ভজহরি ভালই জানে। বহু বছর আগে গঙ্গাধরপুরের রাজবাড়িতে খেলা দেখাতে গিয়ে তার সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে স্পষ্ট দেখেছিল, বারোজন রাজা ঝলমলে পোশাক পরে দরবার ঘরের আসরের বাঁ দিকটায় বসে তার খেলা দেখছেন। যেসব খেলা সেদিন সে দেখিয়েছিল সেইসব খেলার অনেকগুলোই ভজহরির নয়। কোনও প্রেতাত্মা সেদিন ভর করে থাকবে তার ওপর। খেলা শেষ হওয়ার পর একে একে উঠে এসে তাকে একটা করে মোহর বকশিশও দিয়ে গেলেন তাঁরা। তারপর দরবার ঘরের বাঁ দিকে একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। একটা ভারী বাহারি নকশাদার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। স্বচক্ষে দেখা। কিন্তু পরে দেখা গেল, সব অদৃশ্য। সিঁড়ি নেই, দরজা নেই। একজন রাজকুমার তাকে বললেন, “আসরে নাকি কোনও রাজাগজাও ছিলেন না।” ভজহরি এত অবাক হয়েছিল যে বলার নয়।

পরে অনেক রাতে বাড়ির এক আধপাগলা বুড়ো চাকর এসে তাকে চুপি চুপি বলে, “তেনাদের আর কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু আমি পাই।”

“ওঁরা কারা?”

“সে তোমার শুনে কাজ নেই। মোহর তো পেয়েছ, এবার সরে পড়ো।”

“ওঁদের বুঝি অনেক মোহর আছে?”

“মেল মোহর হে, মেলা মোহর। আমাকেও দেন যে, এই অ্যাত মোহর। মোহরের বাক্স মাথায় দিয়েই তো আমি শুই, কেউ জানে না।”

পরদিন ভোরবেলাতেই সরে পড়ল ভজহরি, তারপর মোহর ভাঙিয়ে মেলা টাকা পেয়ে ক'দিন খুব ফুর্তি করে বেড়াল। জলের মতো বেরিয়ে গেল টাকা।

মাসছয়েক বাদে আবার টানাটানি শুরু হল। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তখন ধীরে ধীরে শয়তান ভর করল মাথায়। বুড়ো চাকরটা না বলেছিল তার কাছে অনেক মোহর! মোহরের বালিশে মাথা রেখে শোয়।

মাথার ওই শয়তানই একদিন ভজহরিকে ফের টেনে নিয়ে গেল গঙ্গাধরপুরে। নিশুত রাতে রাজবাড়িতে ঢুকতে তার অসুবিধেও হল

কিছু। ম্যাজিশিয়ানরা অনেক কৌশল জানে।

দরবার ঘরের এক কোণে চাকরটা শুয়েছিল। ভজহরি গিয়ে তার মাথার তলা থেকে বাক্সটা সরিয়ে ওই মাপের একটা বাক্স খুঁজে দিতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ে চাকরটা হঠাৎ জেগে তাকে জাপটে ধরে 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ভজহরি দেখল, তীরে এসে তরী ডুবে আর কী! সে চট করে বালিশটা তুলে চাকরটার মুখে ঠেসে ধরেছিল। বুড়ো মানুষটা এক মিনিটের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ে গেল। ভজহরি আর দাঁড়ায়নি।

গোরুর গাড়ির দুলুনিতে একটু তন্দ্রা এসেছিল ভজহরির। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গাড়োয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কী রে, এত দেরি হচ্ছে কেন?"

গাড়োয়ান বলল, "রাস্তা খারাপ আছে বাবুমশাই, একটু ঘুরে যাচ্ছি।"

ভজহরি আবার চোখ বুজল। গঙ্গাধরপুরের কথা মনে পড়তে মনটা বড় ভার হয়ে যায়। ভয় ভয় করে। খুনটা কেউ টের পায়নি বটে, পুলিশও ধরতে আসেনি, তবু বড় গ্লানি হয়। বাক্সটা চুরি করেছিল বটে, কিন্তু তার ভোগে লাগেনি। যেদিন বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরল সেদিন রাতেই তার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। মোহরের বাক্সসমেত সবকিছু নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। ভজহরি পাগলের মতো ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করেছিল।

পরে জানা গিয়েছিল, সেই ডাকাতদলটা নিজেদের মধ্যেই মারপিট করে এ-ওর হাতে জখম হয়ে মারা যায়। খালধারে পড়ে ছিল সবকটা। মোহরের বাক্স ফের উধাও। তারপর কী হয়েছে তা আর জানে না ভজহরি। জেনে আর কী হবে! দিন ফুরিয়ে আসছে।

ভজহরি চটকা ভেঙে বলল, "কী রে, আর কত দূর! এ যে রাত ভোর করতে চললি।"

"এসে গেছি কর্তা, আর একটুখানি পথ।"

ভজহরি ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন জাগল তখন ভজহরি অবাক হয়ে দেখল, চারদিকে আলো ফুটি ফুটি। ভোর হচ্ছে। গাড়িও থেমেছে। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে গোরুদুটোকে খুলে দিয়ে বলল, "নামুন কর্তা, এসে গেছি।"

ভজহরি অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে বলল, "এ কোথায় এনে ফেললি! এ তো আমার গাঁ গৌরীপুর নয়।"

গাড়োয়ান বলল, "এ হল গঙ্গাধরপুর। আর এটা হল রাজবাড়ি।"

কালকের সেই দশাসই লোকটা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলল, "আসুন ভজহরিবাবু, আসুন। আমাদের সৌভাগ্য।"

ভজহরি সভয়ে বলল, "আমি এখানে কেন?"

"এখানে না এসে যে আপনার উপায় ছিল না ভজহরিবাবু। সেই খেলাটা আর একবার দেখাতে হবে যে!"

৮. রাজবাড়ির ফটকের উলটোদিকে

রাজবাড়ির ফটকের উলটোদিকে বটগাছটার তলায় দিনতিনেক হল একজন সাধু এসে থানা গেড়েছে। তা সাধুসজ্জন মাঝে মাঝে আসে বটে, অভিনব কিছু নয়। রাজা মহেন্দ্র চোখে ভাল ঠাহর পান। দূর থেকে দেখে যা মনে হয়, সাধুর বয়স খুব কম। কালো দাড়ি গোঁফ, কালো জটা। ছিপছিপে গৌরবর্ণ তেজি চেহারা। একজন চেলাও ঘুরঘুর করছে কাছাকাছি।

রানি বিন্ধেশ্বরীও সাধুটিকে জানলা দিয়ে দেখলেন। দেখে বললেন, "আহা, কী কচি বয়সেই ছেলেটা সাধু হয়ে গেছে দেখো। দেখলে মায়া হয়। কোন মায়ের বুক খালি করে বিবাগী হয়েছে কে জানে।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর বুড়ি দাসী সুবালাকে ডেকে বললেন, "ওরে, ওই সাধুকে একটা সিধে দিয়ে আয় তো। আমার নবেন ফিরে এসেছে, বাছার মঙ্গলের জন্য একটু সাধুসেবা করা ভাল।"

সুবালা বলল, "ও বাবা, ও সাধু বড্ড রগচটা। কারও কাছ থেকে কিছু নেয় না। দিতে গেলে তেড়ে আসে।"

"না নিলে না নেবে। তুই তবু নিয়ে গিয়ে দিয়ে দ্যাখ।"

সুবালা সিধে নিয়ে গেল। ফিরে এসে একগাল হেসে বলল, "তোমার কপাল ভাল গো রানিমা। প্রথমটায় চোখ পাকিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু যেই বললুম রানিমা পাঠিয়েছে অমনি একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।"

রানিমার চোখ ছলছল করে উঠল, "আহা রে, বোধ হয় মায়ের কথা মনে পড়েছে।"

মহেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "পড়ারই কথা কিনা।"

রানিমাও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এই শীতে খালি গায়ে বসে থাকে, দেখলে বড় কষ্ট হয়। খুব ইচ্ছে করে একখানা কম্বল দিয়ে আসি।"

মহেন্দ্র বললেন, "তা দিলেই তো হয়।"

রানিমা বললেন "আমাদের আগের অবস্থা থাকলে কি আর দিতাম না! বাড়তি কম্বলই বা কোথায় বলো! একখানা পুরনো বিলিতি কম্বল আছে বটে, তা সেখানা খুব দামি জিনিস। সেটা তো আর দানধ্যানে দেওয়া যায় না! নবেন আবার রাগ করবে। দেওয়া থোওয়া সে বেশি পছন্দ করে না। বলে, দান ধ্যান করে করেই রাজবাড়ির এই দুর্দশা হয়েছে। তা কথাটা মিথ্যে নয় বাপু।"

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন, "তা বটে! নবেনের বেশ বিষয়বুদ্ধি আছে।"

রানিমা পানের বাটা নিয়ে বসে পান সাজতে সাজতে বললেন, "খুব আছে। বাছার আমার চারদিকে চোখ। কুটোগাছটা এদিক-ওদিক হলেও ঠিক টের পায়। তা এরকমই তো হওয়া ভাল, কী বল?"

"খুব ভাল, খুব ভাল।"

রানিমা পান মুখে দিয়ে বললেন, "বাছার আমার তেজও আছে খুব। তার দাপটে গঙ্গাধরপুরে এখন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। বজ্জাত লোকগুলো সব ঢিট হয়ে গেছে। শুনলুম খাজনাপত্রও আদায় হচ্ছে ভালই।"

মহেন্দ্র সভয়ে বললেন, "সবাই খাজনা দিচ্ছে বুঝি?"

"তা না দেবে কেন? আমাদেরই রাজত্বে বাস করবে আর আমাদের খাজনা দেবে না তা কি হয়? নবেন তো আর মেনিমুখো নয় তোমার মতো। ন্যায্য খাজনা আদায় করে ছাড়ছে। বলেছে রাজবাড়ির ভোল পালটে দেবে।"

"বাঃ বাঃ, শুনে বড় খুশি হলাম।"

রানিমা পিকদানিতে পানের পিক ফেলে বললেন, "হ্যাঁ গো এই এতদিন বাদে আমাদের নবেন ফিরে এল তাতে তোমার আনন্দ নেই কেন বলো তো! মুখটা সবসময়ে অমন আঁশটে করে রাখ কেন? বলি তুমি এখনও সেই জডুলটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ নাকি?"

"আরে রামোঃ, জডুল আবার একটা মাথা ঘামানোর মতো জিনিস হল!"

রানি খুশি হয়ে বললেন, "তাই বলো। খবরদার, ওই চোরটাকে আর আশকারা দিয়ো না। ভারী বেয়াদপ লোক। নবেন জানতে পারলে খুব রাগ করবে।"

.

আজ সকালে রাজকুমার নবেন্দ্র তার দলবল নিয়ে ঝিকরগাছার হাটে গেছে। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য রয়ে গেছে মাত্র দু'জন ষণ্ডা। তবে তারা পদসেবা করতে তেমন আগ্রহী নয় দেখে রাজা মহেন্দ্র ভারী স্বস্তি বোধ করলেন এবং দরবার ঘরে সিংহাসনে বসে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগলেন।

"পেন্নাম হই রাজামশাই।"

মহেন্দ্র চোখ চেয়ে শ্রীদামকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "বুড়ো বয়সের কী দোষ জান! যখন-তখন ঘুম পেয়ে যায়।"

"যে আজ্ঞে! তা বয়সেরও তো গাছপাথর নেই আপনার। এই মাঘে আপনার বয়স গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আটান্ন বছর তিন মাস।"

"আটান্ন! বলো কী হে! আমার তো মনে হয় একানব্বই পেরিয়ে এবার বিরানব্বইতে পা দেব।"

"আপনি যদি হুকুম করেন তো তাই। তবে আমার কাছে পাকা হিসেব আছে মহারাজ।"

মহেন্দ্র একটু ভাবিত হলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, “দু-চার বছর কমাতে পার, কিছু মনে করব না। কিন্তু আটান্নটা যে বেজায় কম হে!”

শ্রীদাম হাত কচলে বলে, “তা আটান্ন বয়সটা আপনার পছন্দ না হলে পছন্দমতো একটা বয়স বেছে নিতে বাধা কী মহারাজ! বয়সের ঘাড়ে ক'টা মাথা!”

মহেন্দ্র গভীর চিন্তা করতে করতে বললেন, “বেজায় মুশকিলে ফেলে দিলে হে! দিব্যি বিরানব্বই বছরে এসে ঘাপটি মেরে বসে আছি, তুমি এসে এক ঝটকায় আটান্নয় নামিয়ে দিলে! এত টানাহ্যাঁচড়া আমার সইবে না বাপু! তোমার দোষ কী জান?”

“আজ্ঞে, দোষঘাটের অভাব কী? আমার শত্রুও বলতে পারবে না যে, শ্রীদামের এই দোষটা নেই।”

“তোমার দোষ হল, এক একবার উদয় হয়ে তুমি আমার মাথায় নতুন নতুন সমস্যা ঢুকিয়ে দিয়ে যাও। আটান্ন যে আমার হাঁটুর বয়স! আমি কি আমার চেয়ে এতটাই ছোট! এই হারে যদি বয়স কমিয়ে ফেলতে থাক বাপু, তা হলে তো একদিন দেখব আমি আমাকেই কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”

জিভ কেটে নিজের দু'কান ছুঁয়ে শ্রীদাম বলল, “আস্পদ্ধা মাফ করে দেবেন মহারাজ। তা হলে হাঁটু প্রতি আটান্ন করে ধরে দুই হাঁটু যোগ করলে একুনে আপনি যে বয়সটা চাইছেন তাই গিয়ে দাঁড়ায় বোধ হয়।”

“তুমি বড়ই অর্বাচীন।”

“যে আজ্ঞে।”

রাজা মহেন্দ্র একটু হাসলেন।

শ্রীদাম একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, “মহারাজ!”

"বলে ফেলো বাপু।"

"বলি কাজটা কি উচিত হচ্ছে?"

"কোন কাজটা হে বাপু?"

"একটু আগে আসার পথে দেখলুম, মহারানিমা একখানা বিলিতি কম্বল নিয়ে গিয়ে বটতলার সাধুটাকে দিয়ে এলেন। এতে কি রাজকুমার নবেন্দ্র কুপিত হবেন না?"

"অ্যাঁ!" বলে রাজা মহেন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন, "দিয়ে এসেছে?"

"শুধু কি তাই মহারাজ! সঙ্গে একথালা মিষ্টিও।"

"বল কী হে! ঠিক শুনছি তো!"

"যে আজ্ঞে মহারাজ। বলছিলাম কাজটা কি ঠিক হচ্ছে!"

"তা ইয়ে, শ্রীদাম।"

"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

"ইয়ে, ওই জড়ুলটা এখনও স্বস্থানেই আছে তো!"

"আজ্ঞে মহারাজ, জড়ল একচুলও নড়েনি, নড়ার লক্ষণও নেই।"

স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে মহেন্দ্র বললেন, "ওই জড়ুলটা নিয়েই চিন্তা, বুঝলে শ্রীদাম।"

"বুঝেছি মহারাজ।"

.

রাজকুমার নবেন্দ্র দরবার ঘরে সন্ধেবেলা ম্যাজিক শোর আয়োজন করেছেন। তাঁর হুকুমে বাড়ির সবাই এসে জড়ো হয়েছে। রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন। পাশে জলচৌকিতে রানিমা। মেঝের ওপর শতরঞ্চিতে নবেন্দ্রর দলবল। বাঁ ধারে আরেকটা ফাঁকা চেয়ার সাজিয়ে রাখা।

একধারে স্টেজ সাজানো হয়েছে। নিবু নিবু আলো জ্বলছে চারদিকে। কেমন একটা ভুতুড়ে ভাব।

হঠাৎ এই ম্যাজিক শোয়ের আয়োজন কেন তা রাজা মহেন্দ্র বুঝতে পারছিলেন না। আবার যেন আবছা আবছা একটা কিছু বুঝতেও পারছেন। তবে তলিয়ে বুঝতে তাঁর একটু ভয় ভয় করছে। ম্যাজিক দেখাতে ধরে আনা হয়েছে বুড়ো ভজহরিকেই।

ম্যাজিক শুরু করার আগে ভজহরি স্টেজের পেছনে পরদার আড়ালে সাজগোজ করতে গিয়ে টের পেল তার হাত-পা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। বহুকাল পরে তার নিয়তি কেন তাকে এখানে টেনে আনল তা সে বুঝতে পারছিল না। আরও ভয়ের কথা হল, কুমার বাহাদুরকে তার ভারী চেনা চেনা ঠেকছিল। বছর পাঁচেক আগে ভজহরির একজন সহকারী ছিল। তার নাম বৃন্দাবন। ভারী ভাল হাত ছিল বৃন্দাবনের। এক লহমায় শক্ত শক্ত খেলা শিখে ফেলত। বুদ্ধিও ছিল তুখোড়। খুব বিশ্বাসী ছিল বলে ভজহরি তাকে নিজের জীবনের অনেক কাহিনী শুনিয়েছিল। কিছুদিন ভজহরির চেলাগিরি করে একদিন সে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়।

আজ কুমার বাহাদুরকে দেখে হঠাৎ বৃন্দাবন' বলে ডেকে ফেলায় সে কী বিপত্তি! কুমার বাহাদুর এমন রক্ত-জলকরা চোখে চেয়ে রইলেন যে, ভজহরির বুক হিম হয়ে গেল। কুমার বাহাদুরের স্যাঙাতেরা তো এই মারে কি সেই মারে। হাতজোড় করে ক্ষমাটমা চেয়ে তবে রেহাই পায়।

বুকটা বড় ঢিপ ঢিপ করছে ভজহরির। বহুকাল আগেকার সেই ম্যাজিক শো দেখানোর স্মৃতি ফিরে আসছে বার বার। তাতে ভজহরির শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু উপায়ও নেই। কুমার বাহাদুরের হুকুম হয়েছে সেই রাতে ভজহরি যেসব খেলা দেখিয়েছিল সেগুলোই দেখাতে হবে।

সাড়ে ছ'টায় ম্যাজিক শো শুরু হল। ভজহরি টুপি থেকে খরগোশ বের করার খেলাটা দেখাতে দেখাতে আড়চোখে লক্ষ করল বাঁ ধারের চেয়ারগুলো এখনও ফাঁকা। কোনও রাজা মহারাজাকে দেখা যাচ্ছে না।

এরপর দড়ির খেলা, তাসের খেলা, বলের খেলা। চোখ বেঁধে তির ছুঁড়ে আপেল বিদ্ধ করার খেলাও দেখাতে হল। তফাতের মধ্যে জিমির বদলে এবার লালু আপেল মাথায় নিয়ে দাঁড়াল।

আর আশ্চর্যের বিষয়, আজও অবিকল সেদিনের মতোই পুটুং করে সুতোটা ছিঁড়ে গেল এবং ভজহরি তিরটা সময়মতো আটকাতে পারল না। হাততালির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন খুলে ভজহরি দেখল তিরটা ঠিক গিয়ে আপেলটাকে গেঁথে ফেলেছে আর বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে লালু।

খুব ধীরে বাঁ ধারে চোখ ঘুরিয়ে ভজহরি যা দেখল তাতে তার হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার কথা। বারোটা চেয়ারে বারোজন মহারাজ বসে আছেন। গম্ভীর মুখ। কপালে ভ্রুকুটি।

ভজহরি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। দরবার ঘরের বাঁ ধারে সেই সিঁড়ি, সেই দরজা।

তার অবস্থা দেখে হঠাৎ কুমার বাহাদুর উঠে তার কাছে এসে নিচু স্বরে বলল, "কিছু দেখা যাচ্ছে?"

ভজহরি রাজাদের দিকে কম্পিত আঙুল তুলে কেবল বলল, "ওই ওই..."

"ওঁরা কি এসেছেন?"

“হ্যাঁ... হ্যাঁ... ওই তো...”

“সিঁড়ি! দরজা!”

“হ্যাঁ...হ্যাঁ...ওই তো...”

বলতে বলতে হঠাৎ ভজহরির শরীরটা হালকা হয়ে হঠাৎ শূন্যে ভেসে উঠতে লাগল। ভজহরি চেঁচিয়ে উঠল, “না...না...আর নয়...”

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ভজহরি পাখির মতো দরবার ঘরের ভেতরে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নামে, ওঠে, নামে, পাক খায়। আর ভজহরি চেঁচায়, “আর না...আর না...”

সবাই তাজ্জব হয়ে হাঁ করে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছে।

একসময়ে ফের ভজহরি ধীরে নেমে এল তার জায়গায়। মুখ বিবর্ণ, শরীর কাঁপছে।

আর রাজারা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে একে একে তার দিকে হেঁটে আসতে লাগলেন। ভজহরি যন্ত্রচালিতের মতো কাঁপা হাতে টুপিটা খুলে উলটে ধরল সামনে। গম্ভীর মুখে রাজারা টুং টাং করে মোহর ফেলে যেতে লাগলেন টুপির মধ্যে। ঠিক বারোটা মোহর। তারপর ধীর পদক্ষেপে তাঁরা হেঁটে যেতে লাগলেন সিঁড়ির দিকে।

কুমার বাহাদুর বিদ্যুৎগতিতে এসে ভজহরির হাত থেকে টুপিটা কেড়ে নিয়ে মোহরগুলি দেখে গর্জন করে উঠলেন, “মোহর। মোহর! সিঁড়িটা কোথায়... সিঁড়িটা..?”

ভজহরি হাত তুলে দেখাল, “ওই যে।”

ভজহরির হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে কুমার বাহাদুর ছুটতে লাগলেন, “সিঁড়িটা দেখাও ভজহরি...সিঁড়িটা আমার চাই...”

আশ্চর্যের বিষয়, সিঁড়িটা আজ মিলিয়ে গেল না। সকলের চোখের সামনে সিঁড়িটা দিব্যি দেখা যেতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় কারুকাজ করা দরজাটাও।

ভজহরিকে একটা ঠেলা দিয়ে কুমার বাহাদুর বললেন, "ওঠো, ওঠো ভজহরি, পথ দেখাও।"

কাঁপতে কাঁপতে ভজহরি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। পেছনে কুমার বাহাদুর, তার পেছনে কুমার বাহাদুরের দলবল।

বারোজন রাজা মিলিয়ে গেছেন দরজার ভেতরে। তবু দরজা আজ খোলা। যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

ভজহরির পেছন পেছন কুমার বাহাদুর আর তার দলবল হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়তে লাগল। শেষজন ঢুকে যাওয়ার পর দরজাটা আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল দরজা আর সিঁড়ি।

অনেকক্ষণ কেউ কথা কইতে পারল না। সবাই স্তম্ভিত, বজ্রাহত, বাক্যহারা।

হঠাৎ রানিমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "ওগো, আমার নবেন কোথায় গেল!নবেনের কী হল! ওরে বাবা, আমি যে নবেনকে ছাড়া প্রাণে বাঁচব না। ওগো, আমার নবেনকে শিগগির ফিরিয়ে আনন..."

হঠাৎ লম্বা, ছিপছিপে, গৌরবর্ণ সাধুটি ধীর পায়ে দরবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। গায়ে সেই বিলিতি কম্বল।

রানিমা তার কাছে ছুটে গিয়ে কেঁদে পড়লেন, "ও সাধুবাবা, তোমার পায়ে পড়ি, একটা কিছু করো। আমার নবেন কোথায় গেল..."

সাধুটি একটু হাসল মাত্র। তারপর দুই সবল হাতে রানিমাকে ধরে বলল, "শান্ত হও মা, শান্ত হও..."

রাজা মহেন্দ্র একটু গলাখাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, "তা ইয়ে, শ্রীদাম আছ নাকি হে!"

"যে আজ্ঞে মহারাজ।" বলে সিংহাসনের পেছন থেকে শ্রীদাম বেরিয়ে এল।

রাজা মহেন্দ্র বললেন, "তা ইয়ে, বাপু শ্রীদাম, এবার তা হলে জড়ুলটার একটা সুলুকসন্ধান না করলেই যে নয়! সেটা যথাস্থানে আছে তো?"

"যে আজ্ঞে মহারাজ। সাধুবাবা গা থেকে কম্বলটা নামালেই হয়।"

একটু বাদে যখন সাধুর বাঁ বগলের নীচে জড়ুলটার সন্ধান পাওয়া গেল, তখন মহেন্দ্র সখেদে বললেন, "জড়ুল তো যথাস্থানেই আছে দেখছি হে শ্রীদাম। কিন্তু তোমাদের রানিমার আবার পছন্দ হলেই হয়।"

সাধুকে কোলে টেনে নিয়ে রানিমা কেঁপে কেঁপে কাঁদছিলেন, "ছিঃ বাবা, মাকে কি এত ছলনা করতে হয়! কী ছিরি হয়েছে চেহারার! একমুখ দাড়ি-গোঁফ! আর শীতে কত কষ্ট পেয়েছিস বাবা! কতকাল পেটভরে খাসনি বল তো! তা বাবা এবার আমি ঘটিবাটি বেচে হলেও তোকে দু'বেলা পেটভরে খাওয়াব।"

শ্রীদাম একটা গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "রানিমা, ঘটিবাটি না বেচলেও চলবে।"

রাজা মহেন্দ্র মৃদুস্বরে বললেন, "গুপ্তধন নাকি হে!"

"একরকম বলতে পারেন।" বলে সিংহাসনের পেছন থেকে একখানা কারুকাজ করা ভারী বাক্স নিয়ে এসে সামনে রেখে বলল, "মোট পাঁচশোখানা আছে।"

"এই সেই লোচনের বাক্সখানা নাকি?"

“যে আজ্ঞে মহারাজ।”

“তা ইয়ে, শ্রীদাম।”

“যে আজ্ঞে।”

“এই নবেনকেও যে তোমার রানিমার বেশ পছন্দ।”

“তাই দেখছি মহারাজ।”

“তা নতুন নবেনকে বলল যেন ঘামাচি হলে জড়ুলটা আবার না চুলকোয়।”